সুরের সাগরে

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের বেদতত্ত্ব আলোচনা ও ভাষণ সংকলন।।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অভিনব দর্শন প্রকাশন
প্রকাশন বিভাগ

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

সমগ্র পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-
চপল মিত্র

সংকলনে সহযোগিতায় ঃ-
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় এবং হেনা মিত্র

প্রথম প্রকাশ ঃ-
শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৪
ইং ১৫ই এপ্রিল, ২০০৭

মুদ্রণে ঃ-
মেসার্স এম. দত্ত
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট
কোলকাতা - ৭০০০০১

প্রাপ্তিস্থান ঃ-
১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা (কোলকাতা - ৭০০১১৫)
২) ২৯১ এস. কে. দেব রোড, কোলকাতা-৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

পূর্বাভাষ

প্রকৃতির অনন্ত সৃষ্টির মাঝে পরিদৃশ্যমান এই জগতের জলে স্থলে অন্তরীক্ষে প্রতিনিয়ত বয়ে চলেছে এক মহাচৈতন্যের সুরের ধারা। তাই প্রকৃতির প্রতিটি সৃষ্টবস্তুর মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় অপরূপ সুরের সাড়া। প্রকৃতির সকল জীবের মাঝেই সহজাত এই সুর। তার থেকেই এই জগতের সৃষ্টি। প্রকৃতির এই অনন্ত ধারাবাহিকতার ধারায় রূপে রূপে রূপান্তরিত হতে হতে অসীম অনন্ত গতির সুরে সুরে ছুটে চলেছে জীবকুল মহাশূন্যের বুকে মহাসুরের মিলন ক্ষেত্রে।

আবহমান কাল হতে সাধু ঋষি মহানরা অনন্ত বিশ্বের রহস্যকে জানবার জন্য দেহের মাঝে সপ্ত সুরের (মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রারে) সাধনা করে চলেছেন। প্রতিটি সৃষ্ট জীবের মধ্যে প্রকৃতির অনন্ত শক্তি বিদ্যমান। বিশ্বসুরকে আয়ত্ত করার জন্যই এই দেহযন্ত্র। এই দেহযন্ত্রের সপ্তসুরে ঝঙ্কার তুলে বস্তুর বস্তুত্বকে জানতে জানতে নিজের স্বরূপকে জানাই হল সত্যিকারের সাধনা। সুর সবার ভিতরেই সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই দেহরূপ এই যন্ত্রকে কেন্দ্র করে আমাদের আয়ত্ত করতে হবে অন্তর্যামিত্ব, অনিমা, লঘিমা প্রভৃতি যাবতীয় শক্তি। তখনই জীব জানতে পারবে তার সত্যিকারের রূপকে। জানবে কোথা হতে কেন আগমন আর কোথায়ই বা তার পুনর্গমন।

আমরা এখানে কেউ কোনদিনই ছিলাম না। আর এসেছি বলে চিরদিন থাকবোও না। সমাজ জীবনে আমাদের এত দুঃখ-দুর্দশার কারণ আমরা কেউই প্রকৃতির সুরে নেই। আমরা জানি, এক ফোঁটা-জলও কেউ সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবো না। তবুও আমরা ছল-চাতুরী, খুন-জখম, রাহাজানি করে অন্যের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে নিজেদের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বৃদ্ধি করার চেষ্টা করছি ও সমাজে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করছি। আমাদের মধ্যে রয়েছে ক্লেদ পঙ্কিলতা, সংকীর্ণতা, দ্বন্দ্ব, সন্দেহ, মিথ্যাচার। নানারকম অত্যাচার, অবিচার, নির্যাতন, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করে করে এবং সমাজের নানা বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়ে আমাদের দেহবীণা যন্ত্রের তারে মরিচা পড়ে গেছে। সেই তারে আর সুর ঝঙ্কৃত হয় না। মরিচা ধরা তারে শব্দ হয় না। তবে আমরা এই দেহবীণা যন্ত্র দিয়ে কোন্ সুরের সাধনা করবো? কে আমাদের দেহবীণার তারের মরিচা পরিষ্কার করে দিয়ে আবার সুর ঝঙ্কৃত করবেন? আমরা কিভাবে জানতে পারবো আমাদের পূর্ব-পরিচয়ের কথা? ভবিষ্যতের কথা? কেমন করে জানতে পারবো কেন এসেছি? কোথা থেকে এসেছি? আর কোথায় যাব?

গুরু কৃপাহি কেবলম্। গুরু তাঁর পবিত্র স্পর্শে দেহযন্ত্রের মরিচা ধরা তারের ক্লেদ পঙ্কিলতা পরিষ্কার করে দেন। সেটা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি চান সেই পবিত্র পথে সবাইকে নিয়ে অনন্ত সুরের জগতে পৌঁছে দিতে, যেখানে চিরযুগ চিদানন্দে মহানন্দে থাকতে পারা যায়, যে আনন্দের শেষ নেই। জন্ম থেকে যিনি সুর নিয়ে এসেছেন তিনিই একমাত্র পারেন সুরের জগতে চিরন্তন বসবাসের ব্যবস্থা করতে। তিনিই সহস্র সহস্র সন্তানকে দীক্ষাদানের মাধ্যমে, নামের মাধ্যমে **সুরের সাগরে** টেনে নিতে পারেন।

পরমপিতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত অমৃতময় বেদতত্ত্ব কখনো ঘরোয়া পরিবেশে কখনও বা বিভিন্ন মিটিং ও ধর্মসভায় শ্রুতিলিখন ও ক্যাসেটবন্দী করা হয়েছে। এই বেদতত্ত্ব পাণ্ডুলিপি, শ্রুতিলিখন ও ক্যাসেটবন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করে মুদ্রণাকারে লিপিবদ্ধ করে শ্রীশ্রী ঠাকুরের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নির্দেশমত ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে প্রকাশের গুরুদায়িত্ব তিনি অর্পণ করেছেন। তার জন্য একটি সংকলন বিভাগও গঠন করে নাম দিয়েছেন **'অভিনব দর্শন'**।

'অভিনব দর্শন' প্রকাশনের সাফল্য কামনা করে আশীর্বাদ স্বরূপ তিনি তাঁর বাহনটি আমাদের অর্পণ করেছেন। তাঁর দেওয়া বাহন ও তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা মাথায় নিয়ে চতুর্দশ শ্রদ্ধার্ঘ প্রকাশিত হল **সুরের সাগরে**।

পরিশেষে জানাই, পরমপিতা শ্রীশ্রী ঠাকুরের তত্ত্ব ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন শ্রী অনির্বাণ জোয়ারদার, শ্রীদেবতনু চক্রবর্ত্তী। যে সমস্ত ভক্ত ও গুরুগতপ্রাণ ভাইবোন আন্তরিকতার সঙ্গে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন ও করছেন, তাদের সকলকে জানাই বৈদিক অভিনন্দন **রাম নারায়ণ রাম**।

শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৪
ইং ১৫ই এপ্রিল, ২০০৭

চপল মিত্র
(প্রকাশক, সংকলক ও সংগ্রাহক)

প্রত্যেকটি সমাধি একটি বালুকণা অজস্র বালু কণায় এক একটি দেশ

শ্যামবাজার, কলিকাতা
৮ই জানুয়ারী, ১৯৬১

অনেকদিন সমাধি সম্বন্ধে বলেছি, বাকী ছিল কিছু। তোমরা মূল সমাধি সম্বন্ধে জানতে চেয়েছো। যে যে অবস্থায় আছে, সেটাই সমাধি। জাগতিক ক্ষেত্রে চলায় ফেরায় প্রত্যেকটি অবস্থারই সমাধি নাম হলো। যেটাকে আমরা মৃত্যু বলি, মৃত্যুর অবস্থা হলে অর্থাৎ মৃত্যু হলে আগুনে দিলেও বুঝে না, কেটে ফেললেও বুঝে না। মৃত্যুর যে মাত্রা, যে মাত্রায় গেলে মরে যায়, মনে কর, সেটারও নাম সমাধি। সহজ করে সমাধি কথাটি বলছি।

শাস্ত্রের ব্যাখ্যা অনেক থাকে। কিন্তু যে যে ওতে (সমাধিতে) ডুবে গেছেন, তাদের ব্যাখ্যা অনেক সহজ হয়ে যায়। সংসারে যে যা চিন্তা করে, সেটাও একজাতীয় সমাধি হয়ে যায়। অজস্র বালুকণাতে যেমন দেশ, অজস্র পাই পয়সাতে যেমন লক্ষ টাকা হয়, অজস্র জলবিন্দু নিয়ে যেমন মহাসাগর হয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু যা কিছু আছে আমাদের জাগতিক জীবনে চলার পথে বা যে যেভাবে চলছে, তা সমাধি ছাড়া নয়। এমনি পাই পয়সার দাম না হতে পারে, কিন্তু লক্ষ টাকা পাই পয়সা ছাড়া নয়।

শাস্ত্রের ব্যাখ্যা অনেক থাকে। কিন্তু যে যে ওতে (সমাধিতে) ডুবে গেছেন, তাদের ব্যাখ্যা অনেক সহজ হয়ে যায়। সংসারে যে যা চিন্তা করে, সেটাও একজাতীয় সমাধি হয়ে যায়।

একটি সভা হয়েছিল, 'সমাধি' বিষয় নিয়ে। সেখানে অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। বেশীরভাগ আলাপেই সংস্কারের একটা ছোঁয়াচ ছিল। সেটাই ছোট করে বলছি। প্রত্যেকটি সমাধি একটি বালুকণা। আর এই বালুকণা ছাড়া পৃথিবী নয়। একটি কণাও পৃথিবী ছাড়া নয়। একটি একটি কণা করে পৃথিবী হয়ে গেছে। আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাধির অবস্থা যখন একত্রিত হয়, তখনই হয় মৃত্যুর অবস্থা। ক্ষুদ্র সমাধিস্থ অবস্থাগুলি মহা অবসানের দিকে যাওয়ার ইঙ্গিত। একটা হাঁচি দিলাম, একটা কাশি দিলাম, এক একটি হাঁচি, কাশির প্রত্যেকটি যেন সেখানে (মৃত্যু) পৌঁছে দেবার প্রাথমিক স্তর। এইসব স্তর একত্রিত হলেই আমাদের যে শেষ নিঃশ্বাস ফেলার মুহূর্ত্তটি উপস্থিত হয়, তাকে মহাশ্বাস বলে। অগণিত অবস্থা, অজস্র অবস্থার ভিতর দিয়েই এই মহাশ্বাসের অবস্থা দাঁড়িয়ে যায়। আবার একজন ব্যক্তি হয়তো ৬০ বৎসর বাঁচতো, সে বিষ খেয়ে ৩০ বৎসরে মারা গেল। এই অবস্থায় তাকে যা কিছু করতে হয়েছে, সে কি স্বাভাবিকভাবে তা করেছে?

এক একটি হাঁচি, কাশির প্রত্যেকটি যেন সেখানে (মৃত্যু) পৌঁছে দেবার প্রাথমিক স্তর। এইসব স্তর একত্রিত হলেই আমাদের যে শেষ নিঃশ্বাস ফেলার মুহূর্ত্তটি উপস্থিত হয়, তাকে মহাশ্বাস বলে।

দৈনন্দিন জীবনে সমাধির প্রতিটি স্তর ভেদ করে করে যখন মৃত্যুরূপ সমাধির স্তরে ঘুমিয়ে থাকে, তা থেকে আর ওঠে না। মনে কর, ১১৫° মাত্রায় মৃত্যু হয়। কাউকে ইঞ্জেকশান দিয়ে যদি অজ্ঞান করা যায়, তাহলে তার পা কেটে নিয়ে গেলেও বুঝবে না। তবুও একটা চৈতন্য Refrigerator-এর ন্যায় ভিতরে ভিতরে Maintain করতে থাকে। যে মাত্রাতে বরফ হয়, যন্ত্রটা যখন সেই মাত্রাতে পৌঁছালো, বরফ হয়ে গেল। কাজেই সেই মাত্রাটা এখানে আনতে পারলে দেশময় বরফ হয়ে যাবে। ঐ মাত্রাটা মনের মাত্রায় আনলে অর্থাৎ মৃত্যুর ১১৫° মাত্রাটা মনের মধ্যে নিয়ে এলে মৃতবৎ হয়ে যায়। তখন তাকে কেটে ফেললেও বুঝতে পারে না। কাজেই মাত্রাটা বড় কথা। একটা ঔষধের প্রক্রিয়ায় কারও বাহ্যজ্ঞান রহিত

একটা ঔষধের প্রক্রিয়ায় কারও বাহ্যজ্ঞান রহিত করে দেওয়া যায়। যে মনের দ্বারা এই ঔষধ আবিষ্কার করলো, সেই মন মৃত্যুর যে স্তর, সেই গভীরতায় চিন্তা করলো।

করে দেওয়া যায়। যে মনের দ্বারা এই ঔষধ আবিষ্কার করলো, সেই মন মৃত্যুর যে স্তর, সেই গভীরতায় চিন্তা করলো। চিন্তার সাথে সাথে সেই স্তর অর্থাৎ মৃত্যুর ১১৫°/১২০° মাত্রাটা এসে উপস্থিত হলো।

একজন খাচ্ছে, তাকে বলা হোল যে, সে চুল খেয়ে ফেলেছে। চুল সে যদিও খায়নি, কিন্তু চুলের চিন্তায় চিন্তায় ভিতরে বিষক্রিয়া হয়। তাতে অসুখ, বিসুখ, বমি হতে পারে। চিন্তাই তাকে অস্থির করে ফেললো। অথচ চুল তার ভিতরে ঢুকে নাই।

আমাদের ভিতরে অজস্র অনুপরমাণু আছে। মনের গভীরে যখন কোন চিন্তা করা যায়, ভিতরে ভিতরে রস উৎপাদন হয় এবং তাতে মনের ভিতরে সুন্দর একটি ক্রিয়া হয়ে যেতে পারে। মনের গভীরতায় চিন্তার তন্ময়তার মাঝে তত্ত্বের যখন স্ফূরণ হয়, আপনিই আনন্দের ধারা বইতে থাকে। ঘৃণা সম্বন্ধে কারও জানা আছে বলেই চুল না খেলেও চুলের চিন্তায় বমি আসে। তেঁতুল সম্বন্ধে জানা আছে বলেই তেঁতুলের কথা চিন্তা করলেই জিহ্বায় জল আসে। মৃত্যুর স্তরে নিজের গভীরতায় তন্ময়তায় যখন ডুবে যায়, আপনিই ডুবে যায়। মাত্রা আপনিই উঠতে থাকে। এই চৈতন্য থাকাকালীন মৃত্যুর যে ১১৫°/১২০° মাত্রা এসে উপস্থিত হয়, সাথে সাথে মৃত্যুর সেই স্তরও এসে যায়। সে যখন সেই মাত্রায় গেল, সেই মাত্রায় যাওয়ার সাথে সাথে মৃত্যু হলে যা হয়, অর্থাৎ এমন একটি অবস্থা হয়, তখন তার শরীরের আনুষঙ্গিকগুলো স্পন্দনহীন হয়ে শিথিল হয়ে যায়। তখন তার বাহ্যজ্ঞান থাকে না, তবুও একটু থেকে যায়। কি থেকে যায়? আর একটি মন ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত টিকটিক করে জীবনীশক্তি রাখবার জন্য যা করা দরকার, তাই করে যায়। প্রতিদিনের এই যে ঘুম, জাগতিক যে কোন স্তর পার হয়ে এসেছে। ঘুমের মাঝে ঐগুলো বিরাট আকার নিয়েছিল। সেটাও একপ্রকার সমাধি।

মনের গভীরতায় চিন্তার তন্ময়তার মাঝে তত্ত্বের যখন স্ফূরণ হয়, আপনিই আনন্দের ধারা বইতে থাকে।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

সাগর যখন রয়েছে, আমরা ডোবার জলে স্নান করবো না

২২শে জানুয়ারী, ১৯৬১
শ্যামবাজার, কলিকাতা
৪৬নং ভূপেন বোস এ্যাভিনিউ, কোলকাতা

শ্রীশ্রী ঠাকুর — কি বিষয়ে বলবো?
বি. রায় — আজ্ঞে, যা খুশী।
শ্রীশ্রী ঠাকুর — তাহলে 'খুশী' নিয়েই শোন।

যেই খুশী বা ইচ্ছায় এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, সেই খুশীতেই যে দেহবৃত্তির ভিতরে আনন্দ বা খুশী। এই যে বোধশক্তি আমাদের দেহের ভিতর আছে, সেই দেহবোধ কোন্ বোধ হতে এসেছে? আপনি একটা আপনমনে খুশীতে আপন খুশীতে এই যে জগৎটা সৃষ্টি হলো, তার মূলে কোন্ মূল বস্তু ছিল, যাকে কেন্দ্র করে এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে? যে যা চিন্তা করছো এই সংসারে, সবকিছুই একটা সীমার ভিতর থেকে যাচ্ছে। কিন্তু সৃষ্টির এমনি রহস্য যে, সীমার দ্বারা এর নাগাল পাওয়া যায় না। তাই সীমার বাইরেই রয়ে যাচ্ছে।

বাস্তব বুদ্ধির দ্বারা যা চিন্তায় আনা যায় না, সেই বস্তুটি কি? সুতরাং চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সেই সাধনায় তন্ময় হলেন। এমন কী বস্তু আছে, যা হতে এই গ্রহ, উপগ্রহ, অনন্ত জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। খুঁজতে খুঁজতে তাঁরা

এমন কী বস্তু আছে, যা হতে এই গ্রহ, উপগ্রহ, অনন্ত জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। খুঁজতে খুঁজতে তাঁরা বসে গেলেন, কোথায় এর আরম্ভ? কোথায় এর শেষ? কিন্তু এমনই ব্যাপার খুঁজে আর পাওয়া গেল না।

বসে গেলেন, কোথায় এর আরম্ভ? কোথায় এর শেষ? কিন্তু এমনই ব্যাপার খুঁজে আর পাওয়া গেল না। সঠিকতার সুরে সঠিক পথের সন্ধান দিতে কেউই সক্ষম হলেন না। যতটুকুনু বুঝলেন, যতটুকুনু জানলেন, তাই নিয়েই শাস্ত্রের পর শাস্ত্র, উবাচের পর উবাচ, ভাষ্যের পর ভাষ্য চলতে লাগলো। তখনই গ্রন্থ বাহির হতে আরম্ভ করলো।

যিনি যেভাবে পারেন শাস্ত্রকার, দার্শনিকরা নানা মত দিতে শুরু করলেন। কেউ বলছেন, মীমাসার বাইরে। কেউ বলছেন ভাবাতীত, গুণাতীত, গ্রন্থের বাইরে; বাক্য ও মনের অতীত ‘অবাঙ্‌মানসগোচর’। ক্রমে ক্রমে এমন কঠিন শাস্ত্র রচিত হতে লাগলো যে, তাতে যতই মীমাংসার কথা আছে, ততটাই জটিলতার প্যাঁচ রয়েছে। কাজেই মীমাংসা তো হলোই না, পরিবর্তে শাস্ত্রটা এমন কঠিন হয়ে গেল যে, যেই পড়ছে, তার ভিতর থেকে আর বাহির হতে পারছে না। কারণ যারা লিখেছেন, তারাও ঐ পাকেই ছিলেন। নিজেদের পাকে (প্যাঁচে) তারা নিজেরাই ঘুরে মরেছেন। সেই স্বর্গলোকের কাহিনী থেকে শুরু করে কত আদি-অন্ত, কত লোক-শাস্ত্র আছে, ভাব-রাজত্ব আছে। কিন্তু মূলবীজকে কে আনলো? বীজ হতে গাছ হয়। যে বীজ পোঁতা যায়, তা না হয় গাছ হয়ে বের হলো। কিন্তু তার সেই আদিবীজটা কোথা হতে এলো? এই মীমাংসা নূতন করে কেউ করতে পারেনি। কাজেই যা ছিল প্রথম হতে, তা আজও আছে। গাছ হচ্ছে। ফুল হচ্ছে, ফল হচ্ছে, বীজ হচ্ছে। তা হতে আবার গাছ হচ্ছে। এই যে ‘হচ্ছে’, ‘হয়ে আসছে’; এটাই চলেছে অনন্তকাল ধরে। শুনতে মীমাংসার ন্যায় লাগলেও, মীমাংসা হলো না।

সূর্য থেকে পৃথিবী, আবার পৃথিবী থেকে এ জীবজগৎ—একটা নিয়মের মধ্যে থেকে চলছে। কিন্তু সেই মূলবীজ কোত্থেকে এল? এসব নিয়ে তত্ত্বজ্ঞেরা বসে পড়লেন। বহু সাধনা করে বসে পড়লেন, কত প্রাণপাত করলেন। কেহ মাথা নীচু করলেন। কেহ জলে পড়লেন। কত কঠিন সাধনায় কত জন লেগে গেলেন। কিন্তু সমাধান আর পাচ্ছেন না। তখনই শাস্ত্রকারেরা ভাষাতীত, ভাবাতীত, সীমার বাইরে, অসীম বলে দিলেন। অত কথা তখনই হয় যখন কথার মত কথা বস্তুতে কিছু থাকে না। রাস্তার মাঝে কথা বলা সহজ। রাস্তায় জমিদার সাজা সহজ। পরের ষ্টেশনে নেমে গেলে কে কার জমিদার। কিন্তু গ্রামের জমিদার সাজা কঠিন। জমিদারির অভিনয় করলেই সত্যিকারের জমিদার হওয়া যায় না। সেখানে কাজ করতে হবে। একজন মহাপুরুষ সেজে ফাঁকিবাজি, শয়তানি করছেন। আর একজন ভাবছেন, আমি না হয় বেঠিক, তিনি তো ঠিক। তিনি আবার ভাবছেন, আর একজন ঠিক। এভাবে যদি আরও দশ, বারটা যোগ হয়, তবেই মুস্কিল। কারণ প্রত্যেকেই অন্যকে ফাঁকি দিচ্ছেন। কিন্তু নিজে তো জানছেন, নিজে বেঠিক। এইভাবেই চলে আসছে সাধুর হাট।

রাস্তায় জমিদার সাজা সহজ। পরের ষ্টেশনে নেমে গেলে কে কার জমিদার। কিন্তু গ্রামের জমিদার সাজা কঠিন। জমিদারির অভিনয় করলেই সত্যিকারের জমিদার হওয়া যায় না।

আমি একবার সাধুর মেলায় চন্দ্রনাথ পাহাড়ে গেলাম। যাওয়ার পথেই রাস্তাতে ধুনি জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে শ'চারেক বসে আছে। একজন আমার জ্যাঠামশাইয়ের সাথে, বাবার সাথে কাজ করতেন। তাকে জ্যাঠামশাই বলে ডাকতাম। তিনি আমায় খুব স্নেহ করতেন। দেখলাম, তিনিও আছেন। আমার হাফ-শার্ট গায়ে, ছোট শালু পরনে। তখন শালুর কাপড় পরতাম। কারণ পয়সার অভাব। আর শীঘ্র ময়লা হয় না। ৪/৫ জন ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছে। আমি বললাম একজনকে, কিছু মিলেছে? সে মনে করছে, টাকাই বুঝি। বললো, ও তো ধোঁয়া ছাই হয়ে যায়।

আমি — আর কিছু মিলেছে?

সে ছাই মাখছে আর বলছে, দেহ ছাই, ছাই দেহ। আমি — আপত্তি নেই। কিন্তু পার্ট যখন করে, অভিনয় যখন করে, সেও তো (অভিনেতা) Green Room (সাজঘর) হতে ছাইটাই মেখে সেজেই আসে। রাজাও সেজে আসে। তুমি সেইভাবে দেখছো। তুমি কেন ছাই মেখেছ? এর কি প্রয়োজন?

পার্ট যখন করে, অভিনয় যখন করে, সেও তো (অভিনেতা) Green Room (সাজঘর) হতে ছাইটাই মেখে সেজেই আসে। রাজাও সেজে আসে। তুমি সেইভাবে দেখছো।

সে — আমি এর মধ্যে মনটাকে রাখতে চাই।

আমি — দেখ, ডোমেরা যখন শ্মশানেই থাকে, তাদের বৈরাগ্য আর থাকে না। শ্মশানের আগুনেই রান্না করে খায়। এক বাপের এক ছেলে, মারা গেছে। কান্নাকাটি করে শ্মশানে নিয়া আসছে। ডোমেদের মহা আনন্দ। কারণ ভাল ভাল কাপড় চোপড়, খাট এনেছে। ডোমেদের আনন্দের আর সীমা নাই। সুতরাং তুমিও ডোম হয়ে যাবে।

বিশ্ববিরাট এত সুন্দর মুক্ত পথ সৃষ্টি করেছেন যে, তাতে সহজেই মুক্তভাবে বিচরণ করা যায়। মুক্ত চিন্তা মুক্তভাব জন্মের সাথে সাথে সেটা আমরা পেয়েছি। আমাদের নিজ নিজ সংস্কারের আবিলতা নিজেদেরই সৃষ্টি। চিন্তাধারা যাতে মুক্ত না হয়, সেই চিন্তায় যুক্ত হয়ে তাতেই আমরা আটক হয়ে পড়েছি। এখানে এতবড় আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তু হয়েছে। অগণিত চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। স্রষ্টা স্বয়ং তাঁকে পাওয়ার জন্য, তাঁর সান্নিধ্যে একাত্ম করে নেওয়ার জন্য সৃষ্টির হারমনিটা (harmony) ঠিক করে দিয়েছেন। তাঁর কাছে যাওয়ার পথ সাজিয়ে দিয়েছেন। একটা জিনিস জানতো, নদীর এপার ভাঙে, ওপার গড়ে। স্রষ্টাকে উপলব্ধি করার এমন সাজানো পথ থাকতেও আমরা মনকে বিকৃত করে আটক করে রেখেছি। পানা (কচুরীপানা) ডোবাতে স্থান পেলেও সাগরে তার অস্তিত্ব থাকে না। যাঁর ইঙ্গিতে এই অনন্ত সৃষ্টি, তাঁকে কি সংসারের একটু আবিলতা, ঝামেলা, অশান্তি, কাম, ক্রোধ, লোভ এসে বাঁধতে পারে? তাঁকে কি আটক রাখা যায়? সাগরকে কি পাখার বাতাসে নাড়ানো সম্ভব? এই সংসারে যা কিছু সবই সাগরে পাখার বাতাস।

যাঁর ইঙ্গিতে এই অনন্ত সৃষ্টি, তাঁকে কি সংসারের একটু আবিলতা, ঝামেলা, অশান্তি, কাম, ক্রোধ, লোভ এসে বাঁধতে পারে?

আমাদের সহজ পথ, সহজাত প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে যা আছে, সেটা আমাদের মধ্যে ঠিক আছে। এই যে মনের নানাগতি, তোমার যাওয়ার পথে অন্তরায় হবে না। সাগর যখন রয়েছে, আমরা ডোবার জলে স্নান করবো না। এখানে অনেক নামধারী so-called (তথাকথিত) সাধু-সন্ন্যাসী আছেন, তাঁরা কে যে কি কাজ করছেন, সেটাই চিন্তার বিষয়। অনেকে যাগযজ্ঞ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, তাবিজ-কবচ, পূজাপাঠ করে একটা জটিলতার সৃষ্টি করেছেন। তাতে 'ফ্লু'র মত ছোঁয়াচে হয়ে গেছে। কত গল্প-কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। এত মুনি ঋষির মেলা শ্রীকৃষ্ণের সাথে, দেখে অর্জুন ঘাবড়ে গেল; এইসব দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকে। সেও (শ্রীকৃষ্ণ) তার মায়ের ছেলে ছিল। কে কতটা বড়, তা বলার দরকার নেই। স্রষ্টার কাছে তাদের শক্তিগুলি ধুলার চেয়েও ছোট। স্রষ্টার কাছে সব আবার সমভাবে আছে। আমরা পরিবর্ত্তনের মাঝে রয়েছি। যখন অনন্ত গতির পথে চলে যাচ্ছি, বাড়তে বাড়তে চলেছি। কোথায় স্রষ্টা আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন? তাঁর দিকে নিয়ে যাচ্ছেন রূপে রূপে রূপান্তরিত হয়ে। সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শুক্রকীট হতে প্রতিটি জীবই এক একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়ে এগিয়ে চলেছে বৃহৎ হতে বৃহতের পথে। এত সুন্দর করে স্রষ্টা সবকিছু সাজিয়ে রেখেছেন কেন? নিজেকে আবদ্ধ করে এখানে পাঁকে পড়ে থাকার জন্য নয়।

কোথায় স্রষ্টা আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন? তাঁর দিকে নিয়ে যাচ্ছেন রূপে রূপে রূপান্তরিত হয়ে। সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শুক্রকীট হতে প্রতিটি জীবই এক একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়ে এগিয়ে চলেছে বৃহৎ হতে বৃহতের পথে।

স্রষ্টা একটা অবস্থায় তোমাকে রেখেছেন। স্রষ্টা তোমাকে জানার পথে জাগিয়ে জানাবার পথে নিয়ে যাচ্ছেন। লোভ, মোহ, প্রলোভন, রোগ, শোক ইত্যাদি ষ্টেশনগুলিতে ঠেকছো, তাতে তোমাকে স্মরণ করিয়ে করিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তোমাকে জানার পথে যাবার জন্য, সেই মহাতীর্থের পথে পৌঁছানোর জন্য সবকিছু দেওয়া সত্ত্বেও তুমি প্রাণ দিচ্ছ ছলে বলে কৌশলে। আর সংসারের আবিলতায় ডুবে থাকছো। তারপর আপন মনে করে যাদের বিলিয়ে দিচ্ছ, আঁকড়ে ধরছো, তারাও থাকছে না। স্রষ্টা তোমাকে এক অবস্থায় আবদ্ধ থাকতে দিচ্ছেন না। কেউই এক অবস্থায় থাকতে পারে না। যাকে যা বলছো, মা বলছো, ভাই বলছো এইরূপ অগণিত মা, বাপ, ভাই, সন্তানের মাঝে বেহুঁশ হয়ে রয়েছে জীব। এক একটা অবস্থার মধ্যে

কেউই এক অবস্থায় থাকতে পারে না। যাকে যা বলছো, মা বলছো, ভাই বলছো এইরূপ অগণিত মা, বাপ, ভাই, সন্তানের মাঝে বেহুঁশ হয়ে রয়েছে জীব। এক একটা অবস্থার মধ্যে থেকে জীব পরিবর্ত্তনের মাঝে রূপে রূপে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে।

থেকে জীব পরিবর্ত্তনের মাঝে রূপে রূপে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। সেই আদি মূল শক্তি, যে শক্তি হতে জীবের সৃষ্টি, সেই শক্তি তোমাতে প্রতিষ্ঠিত। তুমি সেই শক্তিতে স্থিত হও। স্মরণের মাঝে বিস্মরণ হইও না। সেই মূলনাদকে, ধ্বনিকে জাগাও। সেই গুণকে (তারকে) নিজের গুণের সাথে এক তার কর। এই বোধশক্তিকে বোধগম্য করার জন্য বার বার জন্ম দিয়ে পরিবর্তনের মাঝে তোমাকে জ্ঞাত করে, বস্তুর বস্তুত্বকে জানিয়ে দিচ্ছে। তোমার শক্তি যে মূলশক্তির সাথে এক যোগাযোগে যুক্ত হয়ে ব্যাপ্তমান অবস্থায় ছিল, এখনও তা আছে। অগণিত জীবের মধ্যে তুমি ছিলে, সবাইকে ছেড়ে এখনো চলার পথে চলছো। হও হুঁশিয়ার। তোমার দেহবীণাযন্ত্রে তোমার এই শক্তি, তোমার এই সুর মূলাধার হতে সহস্রারের মাঝে বাজালে সব বেজে উঠবে। তোমার ভিতর সুরে সুরময় হয়ে যাবে। বড়, মধুময় জিনিস।

সময় সংকীর্ণ। ট্যাক্সির মিটারের মত কাজ করে যাও। জপ করে যাও। স্রষ্টা এমন সুন্দরভাবে সবকিছু সাজিয়ে দিয়েছেন। এখানকার সাময়িক একটু আনন্দ তোমাদের বিভ্রান্ত করলেও যাওয়ার পথে কোনকিছুই অন্তরায় হবে না। এমনভাবে স্রষ্টা ষড়ঋতুকে আকাশে বাতাসে সাজিয়ে দিয়েছেন দেখ। বর্ষার সময় বর্ষা হয়, শীতের সময় শীত হয়। যখন যেটা প্রয়োজন সব দিয়ে দিয়েছেন। ব্রহ্ম (স্রষ্টা, বিরাট) বলছেন, তোমাদের ভাবতে হবে না। নিজেকে ভাব। কোন্ ভাবনার মাঝে ছিলে, এখন কোন্ ভাবনায় আছো, কি তোমার ভাব, কি তোমার রহস্য, সেই ভাবকে জেনে যাও। কোন্ ভাবকে নিয়ে মাতোয়ারা হয়ে আছ, কি তার পরিণাম, ভাল করে বুঝে নাও। সেই মূল সুরের সাথে নিজেকে বিলীন কর। সমস্ত আওয়াজ (ধ্বনি) সেই এক সুরে চলে যাবে। সেই সুরকে সুর দিয়ে সুরে আন। ইংরেজী ২৬টা অক্ষরে কত গ্রন্থ হয়ে যায়। সংস্কৃতে কয়টা অক্ষর দিয়ে কালিদাস মহাকবি হয়ে গেল। কত মহর্ষি আসলেন মূলাধার থেকে ৭টা পর্দা অর্থাৎ সপ্তসুর সাধলেন। জগতের সব সুর এই সপ্তসুরেই বাঁধা। মূলশব্দকে বারবার উচ্চারণ করবে। কতগুলি জীব আছে, শব্দে বাচ্চা হয়। তোমাদের ভিতরের নাদ ধ্বনিতে সব সুর এসে যাবে। এটাই প্রণব ধ্বনি। এতে তন্ময় হয়ে যাবে।

নিজেকে ভাব। কোন্ ভাবনার মাঝে ছিলে, এখন কোন্ ভাবনায় আছো, কি তোমার ভাব, কি তোমার রহস্য, সেই ভাবকে জেনে যাও। কোন্ ভাবকে নিয়ে মাতোয়ারা হয়ে আছ, কি তার পরিণাম, ভাল করে বুঝে নাও।

কিন্তু মাঝখানের গরমিল এমনভাবে যেন ঘিরে না ধরে যাতে হুঁশের মাঝে বেহুঁশ হয়ে পড়তে হয়। কুমোরে পোকার মত অবস্থা যেন না হয়। চারদিকে সংসার, মান, যশ, ধন, ঘরবাড়ি ঘিরে আছে। সংসারে ছেলেপিলে ঘিরে ধরুক। কিন্তু ফাঁদে পড়বে না। আত্মোপলব্ধি করতে হবে। অভ্যাসের দ্বারা সেটা আয়ত্ত হয়ে যাবে। অন্ধকারে যেমন ওস্তাদরা হারমোনিয়ম বাজায়, সেইরূপ আপনাআপনি হতে থাকবে। নূতন শিক্ষা করতে হলে আলোতে বসে পর্দায় অঙ্গুলি দিয়ে টিপে টিপে সা রে গা মা করে পরে অভ্যস্ত হলে হাত পর্দায় আপনি চলে। নিজে প্রথম চোখ বুঁজে সেই নাদ শব্দ ভিতরে অভ্যাস করবে এবং মনে মনে বলবে, 'আমি সেই সত্যকে জানতে চাই।' আপনমনে জপ হতে হতে তখন আপনি বেজে উঠবে। কোথাও যাবার দরকার হবে না। খেয়াল গাইতে প্রথমে অসুবিধা হয়, পরে বেজে ওঠে। বসে অভ্যাস কর। তাহলেই হয়ে যাবে।

চারদিকে সংসার, মান, যশ, ধন, ঘরবাড়ি ঘিরে আছে। সংসারে ছেলেপিলে ঘিরে ধরুক। কিন্তু ফাঁদে পড়বে না। আত্মোপলব্ধি করতে হবে। অভ্যাসের দ্বারা সেটা আয়ত্ত হয়ে যাবে।

আজ ধর্মটা ব্যবসার সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে ফেলেছে যে, সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। এইজন্যই তত্ত্বটা জানা দরকার। তাহলে কাজ করার পক্ষে বেশ সুবিধা হয়। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

বিরাটের প্রতীক মন

রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা
১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩

একাগ্রমনে যেকোন বিষয়বস্তুকে যদি ধ্যান করা যায়, তাহাই যোগ। যে কোন বিষয়বস্তুর উপর যদি মনোনিবেশ করা যায় অর্থবোধে, তাহাতেই কাজ হয়। কতদূর গড়েছে (নিজেকে তৈরী করতে পেরেছে), সেটা হল পরবর্ত্তী কথা। তবে গড়বার (তৈরী হবার) জন্যই সবাই এগিয়ে চলেছে। কেন গড়ছে, নিজেকে গড়বার কি আছে এখানে, সেটাই চিন্তার বিষয়। বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্র, সূর্য এবং সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের পরম্পরায় চলেছে এই বিশ্বের ধারা। এরই মাঝে মনকে প্রতিষ্ঠা করছে এবং ভেবে চলেছে প্রকৃতির গভীর তত্ত্বের কথা। মনও তখন সেই অনুযায়ী গড়ে উঠছে। আমাদের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনুগুলোও জ্যোতির চিন্তা করতে করতে গড়ে উঠবে এবং ঐ আকারে আকার নিয়ে নিবিষ্ট হয়ে যাবে। আকার পেলে গুণগুলিও সেই অনুর ন্যায় এই অনুকে কেন্দ্র করে গুণময় হয়ে উঠছে। চুম্বকের সংস্পর্শে ঘর্ষণে আকর্ষণে যেমন লোহা চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়, ঠিক সেইরূপে বিরাটের চিন্তার সাথে সাথে দেহের অনুগুলি সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তদবস্থা প্রাপ্ত হলে বিরাটের বিষয়বস্তু একই আকারে আকার বিশিষ্ট হয়ে যায়। বিরাটের গুণে যখন গুণবিশিষ্ট হয়ে যায়, তখন সেই গুণ দিয়ে যাহাই বুঝতে চাইবে বা জানতে চাইবে, সবই জানা ও বুঝা যাবে। নিজের অন্তরের শক্তিকে সর্বশক্তির যেকোন আকারে পরিণত করা তখন কষ্টসাধ্য হবে না। যখন সেইসব গুণবিশিষ্ট হয়ে যাবে, সবই জানতে ও বুঝতে পারবে। সেই পথ পদ্ধতি নিয়ে কথা বলতে হবে।

চুম্বকের সংস্পর্শে ঘর্ষণে আকর্ষণে যেমন লোহা চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়, ঠিক সেইরূপে বিরাটের চিন্তার সাথে সাথে দেহের অনুগুলি সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

অজস্র মত ও পথ আছে। সহস্রারে বা দ্বিদলে বা যেকোন চক্রের চিন্তাতে মন নিবিষ্ট করলে সেখানকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থের ভিতর দিয়ে একজাতীয় লালা নির্গত হয়। অর্থাৎ ক্ষুধার আবেগ (চাহিদা) জন্মে। সেটাই ব্রহ্মমূলের চাহিদা।

সহস্রারে বা দ্বিদলে বা যেকোন চক্রের চিন্তাতে মন নিবিষ্ট করলে সেখানকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থের ভিতর দিয়ে একজাতীয় লালা নির্গত হয়। অর্থাৎ ক্ষুধার আবেগ (চাহিদা) জন্মে। সেটাই ব্রহ্মমূলের চাহিদা।

ধরো যোগী সাধনায় বসলো। কয়েকদিন নিবিষ্টচিত্তে সাধনা করার পর তাঁর মনে সন্দেহ হয়, নিজের দেহই আছে কিনা। ঐখানে (মহাশূন্যে) তাঁর স্বরূপ যখন জপ নেয় (গ্রহণ করে), অর্থাৎ ঐখানকার বিষয়বস্তুর সাথে একাকার হয়ে গেলে এখানকার অবস্থা অসহ্য মনে হতে থাকে।

এই সূর্যের এই চন্দ্রের যে ক্ষমতা; সেই আলো সেই তাপের চিন্তার সাথে সাথে আমাদের সমস্ত অঙ্গ, প্রত্যঙ্গাদির ভিতর তাহা মাত্রা মাফিক, মাত্রা অনুযায়ী খেলতে থাকে। গভীর সুরে তন্ময়তার সাথে সাথে এক একটা অনুতে বা অংশতে এক এক রূপ দিচ্ছে। সেই জিনিস আমাদের ভিতর উদ্ভাসিত হলে দেখা যাবে, তুমি এবং বিরাট একই সাথে জড়িয়ে রয়েছো। আজ যাহা সাংঘাতিক বা চিন্তা করতে অদ্ভুত লাগছে, তখন দেখবে চিন্তার সাথে সাথে যেকোন রূপে রূপান্তরিত হতে পারছো। বিশ্ব বিরাটের সবকিছু তখন আয়ত্তের ভিতর আনতে পারবে।

আমরা খণ্ড খণ্ড চিন্তা করছি, অখণ্ড চিন্তা করতে পারছি না। কাজেই খণ্ড খণ্ড চিন্তার ভিতরেই খেই হারিয়ে ফেলছি। এক কোটি টাকা এক টাকা ছাড়া নয়। ১ হতে ১০০ প্রত্যেকটাই সংখ্যা। কেউ হেয় নয়।

কাক ৩° হলে, বিড়াল ৪° হতে পারে। পিঁপড়া এবং হাতী ইত্যাদি যার যার চাহিদা অনুযায়ী খেয়ে পেট ভরায়, সবারই সেইরূপ। মাত্রার বৈষম্য ও তারতম্যতা অনুযায়ী এক এক রূপ হয়। সবারই প্রায় এক অবস্থা, যেমন দেহের বোধ। প্রয়োজনের তাগিদেই বোধের তারতম্যতা। ইহাতে ইহা বুঝা

মাত্রার বৈষম্য ও তারতম্যতা অনুযায়ী এক এক রূপ হয়। সবারই প্রায় এক অবস্থা, যেমন দেহের বোধ। প্রয়োজনের তাগিদেই বোধের তারতম্যতা।

সেই মাত্রাতে মন পৌঁছালে দেখবে যে, ব্রহ্মাণ্ডের এক ছায়া বা ব্রহ্মাণ্ডেরই বা বিরাটের প্রতীক মন।

যায় না যে, কাক বিড়াল হতে বা পিঁপড়া হাতী হতে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট। আমাদের অবস্থা এইরূপ করতে চাই, যাতে সেই মাত্রায় বা ডিগ্রিতে পৌঁছাতে পারি। সেখানে পৌঁছালে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু আয়ত্তে আসে। একটা দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে সমস্ত পৃথিবী পুড়িয়ে দেওয়া যায়। সেইরূপ যে অল্পতাপ আমাদের ভিতর আছে, তাহা আমাদের বাড়াতে হবে, যাতে বিশ্ববিরাটের শক্তি আয়ত্তে আসে। সলতের আগুনে সেই তাপ দাউ দাউ করে জ্বালাতে হবে। অজস্র আংশিক নিয়ে পুরা হয়। আমি এক অংশ, তুমি এক অংশ। এই এক এক অংশকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে পুরা করতে হবে। সেই মাত্রাতে মন পৌঁছালে দেখবে যে, ব্রহ্মাণ্ডের এক ছায়া বা ব্রহ্মাণ্ডেরই বা বিরাটের প্রতীক মন। জল এমনকি সাগরও জমে যায়, মাত্রা অনুযায়ী তাপ কমাতে হয়। এক এক জিনিসের ঠাণ্ডার মাত্রা, মাত্রা অনুযায়ী হয়। তাপের সাহায্যে এই বিরাট মনও জমে যায়। অর্থাৎ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব শক্তি নিজের আয়ত্তে আসে।

২৬টি অক্ষর দিয়ে কোটি কোটি বই লেখা হতে পারে। আমাদের ভিতরে যে অল্প তাপ আছে, সেই তাপকে একই ভাবে বাড়াতে হবে। বস্তুটি অক্ষর যার ক্ষয় নেই। যাহা অবিনাশী, আত্মস্বরূপ, চৈতন্য স্বরূপ। অক্ষরই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, তাহাই বিরাট। তাহাকে ধরা যায়। এই বাস্তবরূপের প্রকাশ অক্ষর দ্বারাই। সাতটি সুর দিয়ে বিশ্বের সমস্ত সুর যেমন ধরা যায়, এই মন্ত্রের সাহায্যে সব সুর ধরা পড়বে।

ভাবের বৈষম্যতায় শব্দের জন্ম। বিষয়বস্তু যখন ধাতস্থে আসবে, ভাষা তখন আপনা আপনি বহির্গত হবে।

পাত্রের ছাপ বা ছাঁচ যদি ত্রুটি (defect) যুক্ত হয়, তবে চেহারাতেও Defect (ত্রুটি) ধরা পড়বে (Vitality বা খোরাকের গরমিল বা বৈষম্যের জন্য বিরূপ চেহারা)। ভাবের বৈষম্যতায় শব্দের জন্ম। বিষয়বস্তু যখন ধাতস্থে আসবে, ভাষা তখন

আপনা আপনি বহির্গত হবে। Dog বা Cat বললে আমরা তাদেরই বুঝি অর্থাৎ সেই সেই বিষয়বস্তুকে বুঝি, তাদের নামকে নয়। ভাষা শুধু প্রয়োগ করা হয়। এতটুকু ক্যামেরাতে এতগুলি চেহারা উঠতে পারে, Magnifying Glass বা medicine-এর দ্বারা তাহা সম্ভব হয়। সেইরূপ এতগুলি তাপের অনুর সম্মিলনে, তাপের সংস্পর্শে মিশ্রিত হয়ে এক একটি দেহ গড়ে ওঠে। এই অক্ষর Self আত্মস্বরূপ; প্রতিটি বিষয়বস্তুই অক্ষর। বস্তুর বস্তুত্বের অস্তিত্বই অক্ষর। ভুল যাতে না কর, সেইজন্য অক্ষরে (যার ক্ষয় নাই, অবিনাশী) মন স্থাপন করতে হয়। আমাদের ভিতর যে Motion চলছে, তাহাই অজপা জপের চেহারা। কিছু না করার অবস্থাও একটা অবস্থা। সুরেই চলুক বা বেসুরেই চলুক, Fountain অহোরহ বয়েই চলেছে। সেই স্রোত কাজেও লাগানো যায়, আবার এমনি এমনিও চলতে থাকে। সেই স্রোতটাই কাজে লাগানো আমাদের কাজ। যে শক্তির দ্বারা কোন কিছু চালানো যায়, সেই শক্তির দ্বারাই stop করা হয়। এই যে শক্তির flow যেদিকে যাক, ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। এই যে ব্যয় হওয়ার তাপ বা সুর, সেই সুর বিরাট, combination of everything (সর্বশক্তির সমন্বয়)। আমাদের দৃষ্টি ছাপিয়ে যাহা গ্রাহ্যের (গ্রহণের) বাইরে, ইন্দ্রিয়ের আয়ত্তের বাইরে, তাহাই এখানে বিরাট আখ্যা পেয়েছে। মন তাকে ছাপিয়ে (অতিক্রম করে) যাবে যখন, তখনই কেবল বিরাট অখণ্ড নাম নিবে।

আমাদের ভিতর যে Motion চলছে, তাহাই অজপা জপের চেহারা। কিছু না করার অবস্থাও একটা অবস্থা। সুরেই চলুক বা বেসুরেই চলুক, Fountain অহোরহ বয়েই চলেছে। সেই স্রোত কাজেও লাগানো যায়, আবার এমনি এমনিও চলতে থাকে।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

আমরা সেই ভগবানকে ডাকবো যাঁকে ডাকলে সহজে বুঝা যায়

মহিশীলা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ

১৭ই এপ্রিল, ১৯৬১

এই জগতের যে ধর্ম, তার অর্থ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বিকৃত হয়ে যাওয়ার দরুণ আজ দেখা দিয়েছে জাতিবিরোধ, ধর্মবিরোধ। আদিবেদে আছে এক ধর্ম জীবধর্মের কথা। সেই বেদের ধর্ম যারা পালন করে আসছেন, তারা আজ বেদকে ঠিকমত পালন করতে পারছেন না। আজ দেশে এত দ্বন্দ্ব এত সমস্যা কেন আসছে? দেশে যদি এক ধর্ম করতে হয়, তার সত্তাকে জানতে হবে। আজ দেশে এমন সব গুরু মহানের উদ্ভব হয়েছে যে, দেশের ক্রমশঃ অধঃপতন হচ্ছে। পূজাপার্বন, যাগযজ্ঞ, হোম, বিধিব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে কার্য করছে যারা, তারা ধর্মকে ব্যবসায়ের দিকে নিয়ে গেছে। আমি তারই প্রতিবাদ জানাতে এসেছি। ধর্মের নামে যারা ব্যবসা করছে ধর্মের নামে যারা সহজ সরল জনগণের সেন্টিমেন্টে ঘা দিয়ে তাদের বিভ্রান্ত করছে, সমাজে মানুষকে ভয় দেখিয়ে দেশকে বিনাশ করতে চেষ্টা করছে, আমি তারই প্রতিবাদ জানাতে এসেছি।

বেদের সত্তা আদি সত্তা। বেদের সুর সমতার সুর, ব্যাপকতার সুর। সেই ব্যাপকতার সুর আজ কোথায়? যে নীতির ফলে খাওয়ার দিক দিয়ে, চলার দিক দিয়ে পরাধীনতা এসেছে, যে ভগবানকে ডাকলে সহজে আমরা পাব না, সেই ভগবান আমাদের নয়। যে ভগবানকে আমরা সহজে পাব, সেই ভগবান আমাদের। যে ভগবান অদৃষ্টের উপর রয়েছে, যে ভগবানকে ডাকতে গেলে নানারকম ছাড়াছাড়ির নীতি নিয়ে বিরোধ বাধে, সেই ভগবানকে আমরা ডাকবো না। একজন যিনি ভগবানকে পেয়ে গেছেন, অমুকে ভগবানকে পেয়ে গেছেন, তমুকে ভগবানকে পেয়ে গেছেন, আর সবাই পায়নি সেই ভগবান আমরা খুঁজবো না। না পাওয়ার কারণ হিসাবে মন চঞ্চল, মন বিক্ষিপ্ত ইত্যাদি নানা কথা দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে। ভগবান সত্যিই আছেন কি? তাইতো কেহ সঠিক জানে না। যে ভগবানকে সহজে বুঝতে পারা যাবে না, আমরা সেই ভগবানকে ডাকবো না। আমরা সেই ভগবানকে ডাকবো, যাঁকে ডাকলে সহজে বুঝা যায়। সেই নীতি আমাদের জন্য নয়, যা দ্বারা ভগবানকে বুঝা যায় না। একজন ব্যক্তি ৩০/৪০ বৎসরের সাধনা দ্বারা যে জিনিস আবিষ্কার করেন, পরে অন্যান্যরা শিখে নিয়ে ৪/৬ মাসে সেটি তৈরী করেন। কিন্তু ভগবদ্দর্শনের ক্ষেত্রে যিনি বললেন, পেয়ে গেছেন, তিনি কি পেয়েছেন, সবাই কি করে বুঝবে?

> ভগবান সত্যিই আছেন কি? তাইতো কেহ সঠিক জানে না। যে ভগবানকে সহজে বুঝতে পারা যাবে না, আমরা সেই ভগবানকে ডাকবো না। আমরা সেই ভগবানকে ডাকবো, যাকে ডাকলে সহজে বুঝা যায়।

আবার কাম, ক্রোধ বন্ধ করলেই যে ভগবানকে পাওয়া যায়, এটা ঠিক নয়। তাহলে কেহ ভগবানকে কোনদিন পাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত দেহে ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান থাকবে, ততক্ষণ কাম, ক্রোধও থাকবে। এইগুলি কোনদিন ত্যাগ হয় না, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। এইগুলি যদি ভগবদ্দর্শনের অন্তরায় হয়, তাহলে তাদের নিয়মেই তাদের ভগবদ্দর্শন হয়নি। এই কাম, ক্রোধ, মায়া, মোহ থাকলে ভগবান লাভ হয় না বলে; কিন্তু দেহ যতক্ষণ আছে, কাম, ক্রোধ, মায়া, মোহ তো তাদের ছাড়েনি।

মন্ত্র জপ করলে কি হয়, তোমাদের ঠাকুর তার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। যাঁরা অনিমা শক্তি নিয়ে আসেন, তাঁরা যদি দীক্ষা দেন, তবে যারা দীক্ষা নিলেন, তাদের ভিতরও সেই শক্তি জেগে উঠবে। ‟আমি সবার মাঝে একাকার করে একবোধ আনতে চেষ্টা করছি। আপনভাবে আপনি যে শক্তি মায়ের পেট থেকে পড়ে জেনেছি, তাই জানাতে এসেছি। আজও আমার হাজার হাজার পাহাড়িয়া শিষ্য আছে। আমি তত্ত্বের খনি থেকে মণি আহরণ করে তোমাদের জানাচ্ছি। বাস্তবিক যদি জ্ঞান পিপাসু হয়, আমি প্রাণভরে জানিয়ে দেব, বুঝিয়ে দেব আদি সত্তার কথা। সাধারণ কর্মী হিসাবে প্রকৃতির তত্ত্ব দান করে আমি আবার চলে যাব। সংস্কারকে হাতে নিয়ে সংস্কার দূর করতে এসেছি আমি। আমি এখানে সাধু বা মোহন্ত সাজতে আসি নাই। প্রকৃতির সাধারণ কর্মী হিসাবে আমি এসেছি। আমাকে মারবার চেষ্টা করেছিল ১০/১১ বৎসর বয়সে। এখানে ব্যাবসায়িকের পাল্লায় পড়ে গেছি। রাগবিহীন অভিমানবিহীন হয়ে আমি সব একাকার করবার চেষ্টা করছি। নিজের কথা বেশী বলা হয়ে যাচ্ছে। অযথা উক্তি করে কেউ যেন নিজের মুখকে নষ্ট না করে। একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস করা যায়। একটা বেনামী চিঠিতে বিয়ে ভেঙ্গে যায়। দেশকে নষ্ট করা সোজা, গড়াই কঠিন।’’ আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

রূপের ভিতর দিয়ে গুণের চিন্তা কর

রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা
১৪ই অক্টোবর, ১৯৫৩

গরুর দুধ থেকে অনেক রকম পদ বের হয়। দুধ খুঁজতে গেলে ঘাসে যেতে হয়। মাখন খুঁজতে গেলে দুধ-গরু-বাছুর সব খুঁজতে হয়। বাছুর যে মাতৃস্তন দোহন করে বা টানে, এই যে টানা, এটাও একরূপ সাধনা। এই টানাতে সার অংশ বেরিয়ে আসছে। সন্দেশ, ঘি, মাখন, দধি তৈরী হল ঘাস, খড়, খইল ইত্যাদি হতে। কেহ গরু হতে চোখের পিচুটি আনবে না। আনলে অভক্তিভরে ছি ছি ছি, রাম রাম করবে। সাপ দেখতে গিয়ে 'বাবারে বাবা' এইভাবে ভয়ার্ত্তভাবই সবাই ব্যবহার করে। তবুও যায় সবাই, তাদের পিছনে Curiosity-এর তাগিদে। প্রেম-দাদের চুলকানি (খাউজায়), পরমুহূর্ত্তেই জ্বালা। আমাদের প্রকৃত তত্ত্ব খুঁজতে হবে, কি চাই আমরা এবং কি পাই। আমাদের চাওয়া পাওয়া এখন এলাচ লবঙ্গের ন্যায় হয়ে গেছে। এগুলি মুখশুদ্ধি। মুখশুদ্ধিতে পেট ভরে না। লবঙ্গ, এলাচ চাওয়া সহজ। কাজেই মন সর্বদা আনাচে কানাচে ঘুরছে এদের পিছনে। এতগুলো দুধ কেহ খেতে চায় না। রসগোল্লা খেতে চায়। একটা রসগোল্লায় যেমন সব আছে; সেই মূল শব্দে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব আছে। যেমন একটি বটবৃক্ষের বীজ নিয়ে যাওয়া মানে ১০০টি বটবৃক্ষ নিয়ে যাচ্ছ। এই যে শব্দ, এই মূলশব্দই হচ্ছে Cheque।

বাছুর যে মাতৃস্তন দোহন করে বা টানে, এই যে টানা, এটাও একরূপ সাধনা। এই টানাতে সার অংশ বেরিয়ে আসছে। সন্দেশ, ঘি, মাখন, দধি তৈরী হল ঘাস, খড়, খইল ইত্যাদি হতে।

এক কোটি টাকার (cheque-এ টাকার অঙ্ক লেখা থাকে না, বসিয়ে নিতে হয়) এই Cheque, ইউনিভার্সের (Universe) ব্যাঙ্কে ভাঙাতে হবে। পথে ডাকাতের পাল্লায় না পড়, লক্ষ্য রাখা দরকার। ডাকাতি মানে বিভ্রান্ত হওয়া। পরমপিতার নিকট হতে আমার (শ্রীশ্রী ঠাকুরের) নিকট হতে দূরে সরে যাওয়া। Cheque নিয়ে প্রত্যেকেই আছ। তবে সাধু হও সাবধান। মানুষ পাওনাদারের পিছনে ছোটে। আর টাকা দেওয়ার জন্য Bank খুলে রাখা হয়েছে। ভাঙ্গাবার লোক আসছে না। আমার (শ্রীশ্রী ঠাকুরের) Cheque বেশীরভাগ শুধু নাম সই করা আর প্রয়োজনমতো টাকার অঙ্ক বসিয়ে নাও। বাইরের জিনিস চিন্তা করলেই বিপদ। যদি রূপের ভিতর দিয়ে গুণের চিন্তা করা যায়, তবে আর ভয়ের কারণ থাকে না। কারণ বিরাটের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। তখন সে কিসের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকে? একজন গায়ক গান গাইতে গাইতে যখন গভীর তন্ময়তার ভিতরে ডুবে যায়, তখন তার গভীর সত্তায় মাঝে মাঝে অনন্ত সুরের সাথে একতান হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে নিজের সুর মিলে যায়। ঠিক এমনিভাবে একজন কারিগর যখন গভীর তন্ময়তায় কাজ করে যায়, তখন তার গভীরসত্তার সাথে অনন্ত বিশ্বের সত্তা এক হয়ে যায়। কিন্তু তার বোধ সব ঠিক থাকে। যেমন মাটিতে থাকলে উঁচুনীচু। আবার উঁচুতে গেলে, উপর থেকে দেখলে যেমন সব এক দেখা যায়, সব সমান দেখা যায়, সেইরূপ এমন একটি মাত্রায় পৌঁছালে দেহের অনুপরমাণুগুলো আপনিই তার রস আস্বাদন করতে থাকে। সে মজে যায়, ডুবে যায়। তাকেই বলে শিবশক্তি। যেমনভাবে অনন্তগতির সঙ্গে নিজের গতি একগতি হয়ে যায়, ঠিক তেমনিভাবেই শিবশক্তির মিলন হয়। যেখানে নদীর শেষ আর সাগরের আরম্ভ, সেই সঙ্গমস্থলে অর্থাৎ এই দুই-এর সঙ্গমেই হলো প্রকৃতি পুরুষের মিলন। সেই গতি যখন অনন্তগতিতে লীন হয়, চির সঙ্গমের মাঝে ডুবে যায়। এই জাগতিক ক্ষেত্রে এই যে জাগতিক ইন্দ্রিয়, তার যে আকাঙক্ষা, তার নিবৃত্তির জন্য যে তৃষ্ণা, সেই তৃষ্ণা নিবারণে তার ভিতরে যতটুকু আনন্দ উপভোগ করি, তা সেই সাগরের এক এক ফোঁটা জলমাত্র। সেই পর্বত (Mountain) থেকে (আজ্ঞাচক্র থেকে) ঝরণা (Fountain) আপন

এই Cheque, ইউনিভার্সের (Universe) ব্যাঙ্কে ভাঙাতে হবে। পথে ডাকাতের পাল্লায় না পড়, লক্ষ্য রাখা দরকার। ডাকাতি মানে বিভ্রান্ত হওয়া। পরমপিতার নিকট হতে আমার (শ্রীশ্রী ঠাকুরের) নিকট হতে দূরে সরে যাওয়া।

যেমন মাটিতে থাকলে উঁচুনীচু। আবার উঁচুতে গেলে, উপর থেকে দেখলে যেমন সব এক দেখা যায়, সব সমান দেখা যায়, সেইরূপ এমন একটি মাত্রায় পৌঁছালে দেহের অনুপরমাণুগুলো আপনিই তার রস আস্বাদন করতে থাকে। সে মজে যায়, ডুবে যায়। তাকেই বলে শিবশক্তি।

জীবজগতে সকলের ভিতর সেই চিরানন্দ বা ব্রহ্মানন্দের ঢেউয়ে বাড়ি (ধাক্কা) খেয়ে আমরা চলেছি। বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলোই হলো তার ইঙ্গিত। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ হয়ে আছে। আমরা চাই পরম তৃপ্তি।

মনে স্খলিত হয়ে সেই মহা সাগরে (সহস্রারে) মহানন্দে ভরপুর হয়ে যাচ্ছে। এই দৈহিক আনন্দের জন্য এতটুকু বীর্যপাতের জন্য মানুষ পাগল হয়ে যায়। আর এই মহাবীর্যপাতে এই মহাসমাধিতে অর্থাৎ এই মাত্রাতে যখন পৌঁছায়, তখন নিজের গভীরতায় তন্ময়তায় এমনভাবে ডুবে যায় যে, বাহ্য জিনিসের সঙ্গে তখন আর কোন সম্পর্ক থাকে না। আবার সবই থাকে। যেমন দ্রুতগতিতে প্লেন চলে গেলে অনেক জিনিস থাকলেও দেখা যায় না। সেই প্রকৃতি পুরুষের সাথে, পরমাত্মার অস্তিত্বের সাথে জীবাত্মার বস্তুর বস্তুত্বের অস্তিত্ব যখন এক হয়ে যায়, সেখানে বিশ্ববোধের সাথে একাত্ম হয়ে নিজেকে বোধগম্য করে; যদিও একই বস্তু বাস্তবে ভেদাভেদ করে দিয়েছে। বাস্তবের সেই ধারাপাতা নিয়ে এই প্রাথমিক (অ, আ, ক, খ) ধারার প্রথম স্তরে এমনি ডুবে যায়। তোমরাও সেই মূলাধার হতে সহস্রার পর্যন্ত যে সপ্তসুর আছে, সপ্তচক্র আছে, সপ্তচক্রের সেই চক্রে চক্রে, সেই সুরের সাথে তন্ময়তায় ডুবে যাবে। জীবজগতে সকলের ভিতর সেই চিরানন্দ বা ব্রহ্মানন্দের ঢেউয়ে বাড়ি (ধাক্কা) খেয়ে আমরা চলেছি। বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলোই হলো তার ইঙ্গিত। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ হয়ে আছে। আমরা চাই পরম তৃপ্তি।

এতটুকু কণা কণা বালুকণা একত্রিত হয়ে দেশ হয়ে যায়। এই এতটুকু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ একত্র করেই সেই মহানন্দের ব্রহ্মানন্দের সৃষ্টি হয়েছে। কোনটাই ফেলবার নয়। সেই কলাপাতার ধারাপাতায় এই ছাব্বিশটা অক্ষর বড় বড় গ্রন্থে ডুবে গেল। প্রকৃতির ধারাপাতার ধারাতে কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপুগুলি আছে। প্রকৃতির এই ধারাপাতে 'ভূর্ভুবঃস্বঃ' অর্থাৎ ভূলোক, ভূবর্লোক ইত্যাদি সমস্তলোকের ভিতর যা আলোকিত করেছে, এই দেহক্ষেত্রেও সেই তেজোরাশি অনন্ত তেজে ভরপুর হয়ে রয়েছে। আবার এই ক্ষেত্রে (দেহবীণাযন্ত্রে) আছে সেই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও কাম, ক্রোধ ইত্যাদি ষড়রিপু। এই কণিকাগুলো একত্রিত করেই হয় পরমানন্দ, চিদানন্দ। এই প্রাথমিক সুর পড়ে রয়েছে এই পরিদৃশ্যমান জগতে।

এই যে সাগর, সেও থম (স্তব্ধ) মেরে যায়, উপযুক্ত ঔষধ যদি পড়ে। সেইরূপে এই বিরাট বিশ্বশক্তিও বরফের মত জমিয়ে দেওয়া যায় উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে।

শুধু মনকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ফেলে দিতে হয়। এই যে সাগর, সেও থম (স্তব্ধ) মেরে যায়, উপযুক্ত ঔষধ যদি পড়ে। সেইরূপে এই বিরাট বিশ্বশক্তিও বরফের মত জমিয়ে দেওয়া যায় উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে। দুধ থেকে দধি হয়। আবার দধি দিলে দুধ যেমন জমাট বেঁধে যায়, সেইরূপ মূলমন্ত্র জপ করে জমাট বাঁধিয়ে দিতে হবে।

ভিতরে অনুভূতি না থাকলে সহজভাবে বুঝানো যায় না। কিন্তু তোমরা বাড়িতে চর্ব্বণ (জপ) করে ভিতরে মিশাবার চেষ্টা করবে একটু স্মরণ করে। হজমের অদ্ভুত ফল এবং অদ্ভুত তার কাজ। এর বিকাশই আমাদের একমাত্র সাধনা। আমাদের ক্ষুধা হচ্ছে। কিসের ক্ষুধা জানি না, বুঝি না। এই যে বলা হল, অতি গভীর কথা, তাও আবার মামুলীভাবে। শুধু কথার কথা বলার ন্যায় বলে গেলাম।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

জড় এবং চৈতন্য একই সূত্রে আবদ্ধ

বি. রায় রোড
৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩

মাত্রাভেদে তারতম্যতার ব্যবধানে (মাটি থেকে রস টানার) ইক্ষুগাছ, নিমগাছ। মাটি, পাথর প্রভৃতি সবকিছুর পরিবর্ত্তিত অবস্থাই হচ্ছে জীবের চৈতন্যের বিকাশ। জড় এবং চৈতন্য একই সূত্রে আবদ্ধ।

জীবন চৈতন্য আত্মা সবই একই অবস্থার বিকাশ। একটি ‘ফুল’কে research (গবেষণা) করতে করতে যত সূক্ষ্মে তুমি যাও আর নিজেকে যদি খুঁজে খুঁজে যাও সূক্ষ্মসৃষ্টিতে তবে একটা জায়গায় দেখবে ‘তুমি’ এবং ‘ফুল’ এক সূত্রে আবদ্ধ। বায়ু, জল ইত্যাদি যে কোন বস্তুর প্রত্যেকটি বস্তুতেই বিশ্বের সবকিছু গুণ আছে। মাত্রাভেদে তারতম্যতার ব্যবধানে (মাটি থেকে রস টানার) ইক্ষুগাছ, নিমগাছ। মাটি, পাথর প্রভৃতি সবকিছুর পরিবর্ত্তিত অবস্থাই হচ্ছে জীবের চৈতন্যের বিকাশ। জড় এবং চৈতন্য একই সূত্রে আবদ্ধ। ফুলের ভিতর এমন Parts আছে, যার জন্য তুমি ফুল দেখতে পাচ্ছ।

প্রাণের সংমিশ্রণে প্রাণের উদ্ভব
আত্মার সংমিশ্রণে আত্মার উদ্ভব
চৈতন্যের সংমিশ্রণে চৈতন্যের উদ্ভব

বহু প্রাণের সম্মিলনেই এক একটি সৃষ্টি। খাদ্যের ফলে ভিতরে যে তেজের উদ্ভব হলো তার ফলে যে বৃত্তি দেখা দিল, তার নিবৃত্তিই হচ্ছে এক একটি সৃষ্টি ছেলে, মেয়ে ইত্যাদি।

চৈতন্য না থাকলে দহন ক্রিয়া থাকতো না। অর্থাৎ এই যে কাঠ বা মানুষ পুড়তো না। কাঠের ভিতরও তাপ আছে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম। যে জিনিস ক্ষয় হচ্ছে, মিশে আছে, বায়ু ও জলের সাথে মিশে যাচ্ছে, তারই প্রাণ আছে। চৈতন্য শক্তি না থাকলে ক্ষয় হয়ে যেতো না বা মিশে যেতে পারতো না। যেহেতু তার প্রাণ আছে, সেইহেতু খাওয়া আছে, দাওয়া আছে। তার ভিতর খাদ্যগ্রহণের অবস্থা ছিল বলেই তুমি খেতে পারছো; সেই তোমার ভিতর যেয়ে পুরিপুষ্ঠিত হচ্ছে। নতুবা তুমি ক্ষয়ের দিকে বা পরিবর্ত্তিত অবস্থার দিকে যেতে পারতে না। এইভাবেই জীব ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে অবসানের দিকে চলে যায়। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। বাতাসে যে প্রাণশক্তি আছে, জলে, খাদ্যে যে প্রাণশক্তি আছে, তাহা খেয়ে খেয়েই তুমি মৃত্যুর দিকে যাচ্ছ। চিন্তার সাথে সাথে দেহের তাপ প্রতিমুহূর্ত্তে শিসের মত বেরিয়ে যাচ্ছে। আবার ময়লারূপে (মল, মূত্ররূপে) শরীরের বর্জ্য অংশ বেরিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে তেজরূপে, ময়লারূপে এবং আরও কতভাবে যে শরীর থেকে বিভিন্ন বস্তু নির্গত হচ্ছে তার ইয়ত্তা নাই। বহু প্রাণের সম্মিলনেই এক একটি সৃষ্টি। খাদ্যের ফলে ভিতরে যে তেজের উদ্ভব হলো তার ফলে যে বৃত্তি দেখা দিল, তার নিবৃত্তিই হচ্ছে এক একটি সৃষ্টি ছেলে, মেয়ে ইত্যাদি।

বাতাস, জল, তাপ, চন্দ্র, সূর্য সবাই যার যার খোরাক খুঁজে বেড়াচ্ছে। যেমন প্রতিটি জীব ছুটছে খোরাকের পিছনে। কার প্রয়োজনে চলেছে এই অনন্ত সৃষ্টির ধারা? বিশ্ববিরাটের সমস্ত পদার্থের সুরের সাড়ায় কোন্ প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে? অজস্র তার যেমন একটি সুর দিচ্ছে, সেইরূপ পৃথিবীর ভিতর বেজে উঠছে সেই সুর। বাতাস, জল, তাপ সবাই আবার আমাদেরই পূজা করছে, আমরা যেমন করছি জীবনধারণের জন্য তাদেরকে। যে জিনিস খেয়ে তুমি বেঁচে আছ, প্রাণ তাদের ভিতরও আছে বলেই বেঁচে থাকতে পারছো। সে আবার খাচ্ছে আমাকে। কারণ আমিও নিস্তেজ হয়ে পরিবর্ত্তনের ও অবসানের দিকে এগিয়ে চলেছি। কি করে সম্ভব? (আমি সবার উদরে, আবার সবাই আমার উদরে) সর্বদা ভাবতে চেষ্টা করবে সে বিষয়।

গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, মা বাবা সর্বদা কামনা করছে আমার ছেলে, আমার মেয়েকে মেরে ফেলো। পূজা, পার্বণ, মানসিক সব দেখি এরজন্যই। কি রূপে? প্রথমে I.A. পাস, B.A. পাস করিয়ে দাও। ২ বৎসর পর তারপর সে চাকুরী করুক। কাজেই তুমি মৃত্যুর পথে এগিয়ে দিলে, ২০ বৎসর হতে ২২ বৎসর। আগুনে যেভাবেই হাত দাও, হাত পুড়বেই। সেইরূপ সবাই মিলে পিছনে লেগেছে আয়ু কমিয়ে দিতে। ভগবানের নিকট চাওয়াই এখন গণ্ডগোল হয়ে গেছে। চাওয়ার বস্তু

নিজেকে খুঁজলে পাওয়া যায় চামড়া, রক্ত, মাংস, জল, বাতাস, আগুন, আরও বহু পদার্থ নাম নেই, এইরূপ আরও পদার্থ। সবাই বলে, 'আমি ঠাকুর্দা', 'আমি বাবা'। ১০০০ (এক হাজার) বৎসর যদি সবাইকে বাঁচিয়ে রাখা যায়, তবে 'সবাই বাবা'। 'আমার' (নিজে) অস্তিত্ব সব বাবার মিলন।

ভিত্তিহীন। যেমনি মিশ্রণে বাচ্চা হয়, তেমনই মিশ্রণে দর্শন হয়, স্পর্শন হয়, হজম হয়। নিজেকে খুঁজলে পাওয়া যায় চামড়া, রক্ত, মাংস, জল, বাতাস, আগুন, আরও বহু পদার্থ নাম নেই, এইরূপ আরও পদার্থ। সবাই বলে, 'আমি ঠাকুর্দা', 'আমি বাবা'। ১০০০ (এক হাজার) বৎসর যদি সবাইকে বাঁচিয়ে রাখা যায়, তবে 'সবাই বাবা'। 'আমার' (নিজে) অস্তিত্ব সব বাবার মিলন। কাজেই 'বাবার হাট' বসে গেছে। একটা বাবা বাদ দিলেই গণ্ডগোল। জল, বাতাস সবার বেলায়ই এইরূপ 'বাবার হাট'-এর ন্যায় অবস্থা। বাবার উপর রেকারিং (Recurring) শেষবেলায় দেখা যায়, একই বাঁধনে সবাই বাঁধা ও গাঁথা।

আগুন যেখানে বাতাস সেখানে বেশী। তাপ হলে সে জায়গা হালকা হয়ে যায়। হালকা হলেই সেই জায়গা পূরণ করবার জন্য বাতাস ছুটে আসে। আবার বৃষ্টি হয়।

প্রত্যেকের ভিতরে প্রাণ আছে। এই প্রাণের সম্মিলনেই সৃষ্টি। প্রাণের সংমিশ্রণে প্রাণ, জীবের সংমিশ্রণে জীব। যে সুর তুমি দিচ্ছ, সেই সুর বিশ্ব বিরাটের সুর। ইহা যখন তুমি বুঝতে পারবে, তখন যেখানে ইচ্ছা সেখানে তোমার মনকে স্থাপন করে সেই সুরে সুর দিতে পারবে। এই সুরকে আয়ত্ত করাই আমাদের সাধনা। এই সাধনা হচ্ছে মূলমন্ত্রের সাধনা, মূলের সাধনা। কাজেই এই শব্দ উচ্চারণ করলেই সফলতা আসবে। এই শব্দ বা মূলমন্ত্র জপেতে মুক্তি আসবে। বাঁশী বাজলে সাপ, জীবজন্তু ছুটে আসে। বিভিন্ন বিভিন্ন সুর, বিভিন্ন শব্দের উচ্চারণ এক এক জীবের উপর এক এক ক্রিয়া করে। সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হচ্ছে বা নির্বাণ হচ্ছে বা ঘুমিয়ে পড়ছে। তেঁতুল খাওয়া হলো না। কিন্তু সেই নামেই দু'চার ঢোক থুথু খেয়ে ফেললো। আবার চুণ খাওয়াতে, সর্প নামেতে (চিন্তাতে, ভীতিতে) অন্যরূপ ক্রিয়া। শব্দের অর্থবোধ যখন থাকে, তখন তার ক্রিয়া হয়। অথচ জানা না থাকলে ক্রিয়া হয় না। মাকড়সার জালের ন্যায় 'বুড়ির চুল'। চিনি, একটু তাপ দিয়ে ঘুরালেই সৃষ্টি হয় এক খাদ্য; দাম ১ পয়সা। আগুন যেখানে বাতাস সেখানে বেশী। তাপ হলে সে জায়গা হালকা হয়ে যায়। হালকা হলেই সেই জায়গা পূরণ করবার জন্য বাতাস ছুটে আসে। আবার বৃষ্টি হয়। নদীর জল, সাগরের জল তাপেতে শুকিয়ে যাওয়ার পর, তাপ নিজের সাথে মিশিয়ে নিয়ে গেল; একেবারে দেখা গেল না নিয়ে যাওয়ার পদ্ধতি। আবার যখন নীচে ফেলে দিল, অঝোর ধারায় ভাসিয়ে দিয়ে গেল। মূলমন্ত্র বা মূলশব্দে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত শক্তি নিহিত থাকে।

চিন্তা যত বেশী করবে, অর্থবোধ যত বেশী হবে, তত বিরাট হবে। করতে করতে এমন হবে যে, অভ্যস্ত হয়ে যাবে। এতগুলি অর্থ ভাবতে হবে না, আপনি জেগে উঠবে। তোমরাও সেই অনুযায়ী মিশে যাবে।

একটা তাপে যদি সমগ্র নদী শুকিয়ে যায়। 'তেঁতুল' এই শব্দ উচ্চারণেই যদি মুখে লালা এসে পড়ে, তাহলে দেখা যাচ্ছে, সেই খণ্ডে খণ্ডে আছে সেই অখণ্ডেরই সুর। প্রতিটি বস্তুই সেই অনন্ত বিরাটের বার্তা বহন করে আনছে। তাই মূলমন্ত্রের ভিতর সর্বশক্তির সবকিছু আছে। জপের সাথে সাথে আমার ভিতর ঝংকার দিয়ে ওঠে (যেমন বাসন পড়ে গেলে বা যন্ত্র বাজালে হয়)। চন্দন বৃক্ষের সংস্পর্শে অন্যান্য বৃক্ষও চন্দন বৃক্ষ হয়ে যায়। চুম্বকের স্পর্শেও সেইরূপ চুম্বকত্ব হয়ে যায়। সেই বিরাট অর্থবোধ যখন আমার মধ্যে বাড়ি (আঘাত) খেতে থাকে, বিরাট অর্থজ্ঞানে যখন পুনঃপুনঃ স্মরণ হতে থাকে, চিন্তার সহযোগিতায় উপস্থিত হয়ে যে পাত্রতে রাখা হল, রাখার সঙ্গে সঙ্গে পাত্রের যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থগুলো সেই বোলে বোল দিতে থাকে। বাড়ি খেতে খেতে চন্দন বৃক্ষের ন্যায় আর একটি চন্দন বৃক্ষে পরিণত হয়। যেমন চুম্বকের সংস্পর্শে চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়। চিন্তা যত বেশী করবে, অর্থবোধ যত বেশী হবে, তত বিরাট হবে। করতে করতে এমন হবে যে, অভ্যস্ত হয়ে যাবে। এতগুলি অর্থ ভাবতে হবে না, আপনি জেগে উঠবে। তোমরাও সেই অনুযায়ী মিশে যাবে। যেমন জল মিশে যায় তাপেতে, টের পাওয়া যায় না। মিশে যাওয়ার সাথে সাথে তোমার সাড়া, তোমার সত্তা, তোমার সুর কোটি মাইল ব্যাপ্তমান হয়েও এই সাড়ে তিন হাতের মধ্যে আমার (তোমার) আমিত্ব বোধের সব ভাবে দেখা দেবে। এইভাবে চলছে চলছে, চলছে যুগ যুগান্তর। সন্তান যেন ভালভাবে প্রসব হয়, তার জন্যই সাধ, ইহাই স্বাদ। সেই স্বাদকে আমরা বিরাট বোধে নিয়ে যাব।

যতবেশী জপ করবে, মন্থন করবে, তখন দেখবে, বিরাট পাহাড় এসে দেখা দেবে। সব হজম হয়ে যাবে তোমার ভিতর। ১টা বীজ থেকে হয় অজস্র বীজ, লক্ষ বীজ। লক্ষ্যভ্রষ্ট না হলে এক লক্ষ অজস্র লক্ষে পরিণত হবে। বহুবীজ দেখা দেবে অর্থাৎ তোমার ভিতরে সর্বভাবে সর্বশক্তির স্ফূরণ হবে। তখন তুমি এবং সে যে এক, বুঝতে পারবে।

গুরু হচ্ছেন গতিদাতা। গুরুই সাধনা। একেই বলে যোগাযোগ। বীজের যে শাঁস, সেই শাঁসটি আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে সাথে বারবার টানতে হবে। সেখানেই গণনা সার্থক হবে।

মূলাধার হতে অনাহতে যখন বাঁশির সুর সেই নিনাদের সুর দেবে, সুর দিতে দিতে যখন বাঁশিতে সুর হুঙ্কার দেবে, সেই সুর যখন বিশুদ্ধে আজ্ঞাচক্রে একত্রিত হবে, সেই নাদ সেই সুরে যখন ভিতরের সব সুর এক জায়গায় নিবিষ্ট হবে, তখন যেন মৃত্যুর অবস্থা, তখনই হয় সমাধি। সূর্য যেমন ছড়িয়ে আছে সারা বিশ্বময়, কিন্তু ভারি কাঁচের গ্লাসে একত্র (concentrate) করলেই আগুন জ্বলে ওঠে।

সূর্য যেমন ছড়িয়ে আছে সারা বিশ্বময়, কিন্তু ভারি কাঁচের গ্লাসে একত্র (concentrate) করলেই আগুন জ্বলে ওঠে।

সেই আগ্নেয়গিরির অগ্নি, সেই জ্ঞানাগ্নি ছড়িয়ে থাকে। জ্ঞানাগ্নির অগ্নি নিনাদের সুরে সেই মাত্রায় গিয়ে যখন উপনীত হয়, আজ্ঞাচক্রে এসে মিলিত হয়, মৃত্যুর যে স্তর তার যে মাত্রা তাতে যখন মিলন হয়, তখন স্ফূরণ হয়। তখন দেখা যায় ভিতরকার স্ফূরণতা। দশ হাজারের বেশী সুর একত্রিত হয়ে বিরাট অগ্নিকাণ্ড হয়ে যায়। মূলাধার হতে সহস্রার পর্যন্ত সব সুরগুলো যখন একত্রিত হয়, প্রাথমিক গতিটায় সেই Ultraviolet ray, X-ray যন্ত্রের মত ভিতরকার সব দেখা যায়। তখন দেখা যায় মহাপর্বের প্রণব, তখন দেখা যায় ভিতরকার সুর। সেই সুর সহস্রারে যখন প্রস্ফুটিত হয়, সেই স্ফূরণতার ভিতর দিয়ে ১০ হাজার মন একত্রিত করে চলে যায় আরও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্তরে। বিদ্রুপকারীরা বিদ্রূপ করে। কিন্তু কোন নালায় নদীকে ভরপুর করতে পারে না। কোন অবস্থায় তাকে বিচলিত করতে পারে না। কারণ তখন সেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এমন এক জায়গায় যায়, এমন বিভোরতায় ডুবে যায় যে, সেই স্থানে শিবশক্তির মিলন হয়। সেই ব্যক্তির অনন্ত সুরে, সেই সূত্র ধরে, সেই পরমব্রহ্মের নিজ আত্মার সঙ্গে, পরমাত্মার সঙ্গে সে যে এক আত্মা, এই চিদানন্দ তখন অগণিত ধারায় বয়ে যাচ্ছে। সে তখন এক (নিজ) আত্মার সঙ্গমে, চির সঙ্গমে ডুবে যায়। এতটুকু বীর্যপাতের জন্য তোমরা উন্মাদ হয়ে যাও। এই মাত্রায় যে এক আত্মা, সে তখন অগণিত ধারায় বয়ে যাচ্ছে। এক আত্মার সঙ্গমে ডুবে গিয়ে চিদানন্দ ব্রহ্মানন্দের স্বাদ উপলব্ধি করছে। এতটুকু বীর্যপাতের জন্য তোমরা পাগল হয়ে যাও। আর ওই মাত্রায় সেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের নিকট তখন বাস্তবতার জ্ঞান থাকে না। বাস্তবতার মূল্য তখন পাই পয়সার ন্যায় মূল্যহীন হয়ে যায়।

এতটুকু বীর্যপাতের জন্য তোমরা পাগল হয়ে যায়। আর ওই মাত্রায় সেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের নিকট তখন বাস্তবতার জ্ঞান থাকে না। বাস্তবতার মূল্য তখন পাই পয়সার ন্যায় মূল্যহীন হয়ে যায়।

এক পাই এক পাই করে সেই মহাসমাধিতে চলে যেতে হবে। তাই সমাধির আদি হচ্ছে এই জগৎ। ইহাই প্রাথমিক পাঠশালা। এই সূত্র ধরে ধরে সেই ধারায় চলে যেতে হবে। আমার বেদ আমি নিজে। আমার গ্রন্থ আমি নিজে। আমি ভিতরকার সত্তা হতে সব জেনে বলছি। দিনের পর দিন আমি অনর্গল তত্ত্ব বলে যেতে পারবো। এই বিশ্বতত্ত্ব সুন্দরভাবে চলবে। আমার সেই জীবনগ্রন্থ জানলে অবাক হতে হবে। শুধু Geography পড়ে দার্জিলিং জানা যায়, ঘোরা হয় না। বিরাট পৃথিবীরূপ মানচিত্র পড়ে রয়েছে, ঘুরতে হয়। জীবনের মানচিত্র পড়তে হয়। এটা আলাদা জিনিস। এটা দশায় পড়া নয়, ভরে পড়ার কথা নয়, সংস্কারের কথা নয়। এটা বিজ্ঞানসম্মত আলাদা জিনিস। যাই করবে, একটু জানার জন্য আকুল হবে, বুঝবার জন্য ব্যাকুল হবে। জানার বুঝার তৃষ্ণা জাগলে পিপাসা আপনি মিটবে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। আজ এই থাক।

শুধু Geography পড়ে দার্জিলিং জানা যায়, ঘোরা হয় না। বিরাট পৃথিবীরূপ মানচিত্র পড়ে রয়েছে, ঘুরতে হয়। জীবনের মানচিত্র পড়তে হয়। এটা আলাদা জিনিস।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অনন্ত বিশ্বের সুরই হচ্ছে শব্দ, সেটাই মন্ত্র। সেটাই আমরা স্মরণ করছি

শ্যামবাজার, ভূপেন বোস এ্যাভিনিউ,
১৬ই মার্চ, ১৯৬১

আজ আস্তে আস্তে বলতে হবে। আজ আমি গল্পচ্ছলে তত্ত্ব বলবো। এই জগতে, এই জীবলোকে যত সৃষ্টি আছে, প্রতিটি সৃষ্টবস্তুর ভিতর দিয়ে আজ পর্যন্ত যাঁরা মহান হয়েছেন, অবতার হয়েছেন, ভগবান হয়েছেন, শুধু তাঁরাই নয়, যাঁরা এই পৃথিবীতে এসেছেন, এই সৃষ্টির সকলের ভিতর মহান বীজ বা শক্তির বীজ আছে। তবে কেন একজন বিরাট হয়ে যাচ্ছে, আর একজন হচ্ছে না? যাদের হচ্ছে না, তারাও হওয়ার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। কারণ সৃষ্টির ভিতর সবাই একই স্কুলে পাঠ নিচ্ছে।

পৃথিবীতে এই জমি জায়গা নিয়ে, কাঠার অধিকার নিয়ে, এই যে মারামারি কাটা কাটি; জায়গাগুলি যেরকম, নামগুলি সেইরূপ, পৃথিবীর চেহারা তাতে বদলে যায় না। এই পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ নম্বর, লক্ষ লক্ষ নাম জায়গা আছে। আমরা এক দেশ থেকে অন্য দেশে মারামারি করছি। দেখছি, আমরা এই পৃথিবীর মাটি নিয়ে মারামারি করছি। তবুও মনে করি, এইটা আমার মাতৃদেশ। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা একই পৃথিবীর মাটি। দাগ কেটে কেটে আমরা বিভিন্ন নাম বিলিয়ে দিয়েছি। তাতে পৃথিবী বদলিয়ে যায়নি। এভাবে একদেশ থেকে আর একদেশ, পৃথিবীর বহুদেশে কত মারামারি। পৃথিবীর উপরটুকু নিয়ে সব হৈ চৈ। একই দেশ, আমরা বলি, অমুক দেশ অত বড়লোক হয়েছে। সেখান থেকে লোক এসে বলছে, তোমাদের দেশ কুঁড়ে। আমাদের দেশ এরূপ নয়; যেমন, এই আঙ্গুল ঐ আঙ্গুলকে বলছে। একই পৃথিবী নিয়ে মারামারি। একই পৃথিবীর জমি নিয়ে মারামারি। একই পৃথিবী নিয়ে মারামারি, যেখানে খুঁড়ে জল বের করতে হয়। আমরা বলি, আমাদের দেশ গরীব। পৃথিবী কি গরীব? আমরা তাকে গরীব সাজিয়েছি। আমেরিকা খুব বড়লোক, ধনীর দেশ। পৃথিবী তাতে ধনী হয়ে যায় না।

পৃথিবীতে এই জমি জায়গা নিয়ে, কাঠার অধিকার নিয়ে, এই যে মারামারি কাটা কাটি; জায়গাগুলি যেরকম, নামগুলি সেইরূপ, পৃথিবীর চেহারা তাতে বদলে যায় না।

পৃথিবী তার আপন সত্তায় আপনি রয়েছে। সেখানে ধনীও নেই, গরীবও নেই। তার (পৃথিবীর) উঠানামাও নেই।

আমরা যাকে ধনী বলে বলছি, তার হয়তো ৪৮তলা, ১০০ তলা দালান আছে, পৃথিবী তাতে ধনী হয়ে যায় না। কুঁড়ে ঘরের পৃথিবী চাই। আবার ১০০ তলারও চাই পৃথিবী। ওই কুঁড়ে ঘরের জায়গায় ২০০ তলাও তৈরী করা যায়। ঐ কুঁড়েঘর ভেঙে তলার পর তলা বসানো যায়। পৃথিবীর জায়গায় জায়গায় ধনী গরীব ইত্যাদি নাম দিচ্ছি আমরা নিজেরা। কাজেই আমরা বলছি, আমাদের দেশ গরীব দেশ। আমাদের জায়গা গরীব জায়গা। পৃথিবী কিন্তু গরীব নয়। দেশকে সাজাতে হবে, বড় করতে হবে। কার দেশ, কাকে বড় করবে, কাকে ছোট করবে। পৃথিবী তার আপন সত্তায় আপনি রয়েছে। সেখানে ধনীও নেই, গরীবও নেই। তার (পৃথিবীর) উঠানামাও নেই। তাতে সে (পৃথিবী) উঠেও না, নামেও না। ঠিক এমনি করে ভগবান বা মহানদের উঠানামা নিয়ে আমরা টানাটানি করছি। সকলেই মাতৃগর্ভ হতে যোনিদ্বার দিয়ে এসেছে। আমাদের দেশে শোনা যায়, অমুকে মহান হয়েছেন, তিনি অসাধারণ। যে সাধারণ, তার ভিতরেও অসাধারণ হওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। যাকে কুঁড়েঘর বলা হয়েছে, তার ভিতরেও অসাধারণত্ব রয়েছে। পৃথিবীর এই জায়গাটা গরীব, ঐ জায়গাটা ধনী। গরীবের জায়গা ভেঙে যেমন বড়লোকের জায়গা করা যায়, তেমনই সাধারণকেও অসাধারণত্বে পৌঁছিয়ে দেওয়া যায়, যদি তাদের ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়। ভিক্ষুক যেকোন মুহূর্তে ধনী হতে পারে, যদি ধনী হওয়ার রাস্তা তাকে বাতলিয়ে দেওয়া যায়। কাগজ বিক্রী করেও আমাদের দেশে অনেকে বড়লোক হয়ে গেছে। যদি পথ ধরিয়ে দেওয়া যায় যেকোন ব্যক্তি ভগবান, যে কোন ব্যক্তি অবতার হতে পারে; যেকোন ব্যক্তি মহান হতে পারে। পৃথিবী পড়ে আছে, বীজকে সুযোগ দিলেই ফুটে উঠবে।

সূর্য উঠে আছে। তাকে ঘরে আনতে হলে জানালা দরজা করতে হবে। আমাদের মধ্যে যারা সাধনা করে আসছেন আজীবন ধরে, তাদের যে হবে না, তা নয়। তারাও যে সেই অর্থের ভাগী। অনেকগুলো পাই নিয়ে লক্ষ টাকা হয়। এক পাই এক লক্ষ ছাড়া নয়। তাই এই জীবন যাত্রার ভিতর শুধু

শুধু মানুষ নয়, জীবজগতের সকল জীবের ভিতর, সকল বস্তুর ভিতর এই অসাধারণত্বের বীজ রয়েছে। সুযোগ পেলেই ফুটে উঠতে পারে। কিন্তু আমরা অদৃষ্ট, কপাল ইত্যাদি নানা কথার উপর ছেড়ে দিয়েছি।

মানুষ নয়, জীবজগতের সকল জীবের ভিতর, সকল বস্তুর ভিতর এই অসাধারণত্বের বীজ রয়েছে। সুযোগ পেলেই ফুটে উঠতে পারে। কিন্তু আমরা অদৃষ্ট, কপাল ইত্যাদি নানা কথার উপর ছেড়ে দিয়েছি। এখানে কর্মের সাধনাকে ভাগ্য, কপাল বা অদৃষ্টের উপর রাখা চলে না। মাটি খনন করলেই জল পাওয়া যায়, যে জল মাটির নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। এই মরুভূমির ভিতর দিয়ে অহর্নিশ বয়ে যাচ্ছে, সেই ফল্গুধারা; মনের সেই ধারাকে খনন করে বহির্গত করতে হবে। তা যদি পারি, পরম সুরের সেটাই হবে সুর, যা আয়ত্ত করলে সব জানা যায়, বুঝা যায়। আমরা যদি সুরের সাধনায় বৃষ্টি, জল বা ঝড় টেনে নামাতে পারি, সেটাই সুন্দর। আমরা প্রতিক্ষণে কত ছল, বল, কত কৌশল, কত বৃত্তির ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। ভাবছি পাপ করছি, পুণ্য করছি। মনে করছি, কত অপরাধ করছি। এগুলোর দ্বারা মনকে বুঝাবার চেষ্টা করছি। নিজেরাই নিজেকে classify করছি। এগুলো হচ্ছে সাপের খোলসের মত। জীবনের ছল, বল, কৌশল, এগুলো সব সাপের খোলসের মত পড়ে থাকে। সত্যের যেটা আধার (আশ্রয়), সেটাই বহির্গত হতে থাকে। আমাদের জীবনযাত্রার পথে এমন কেউ নেই যে, ছল বল কৌশল ছাড়া চলতে পারে। জীবনের চলার পথে ছল বল কৌশল সব নিয়ে থাকতে হয় বাস্তব জগতে। কারণ অন্তর্যামিত্বহীন দেশ। সেখানে ছল বল কৌশল সবটা মিলিয়েই কাজ করে যেতে হয়, নতুবা উপায় নেই। তবে কি ভগবৎ দর্শন হবে না? এতে যদি ভগবৎ দর্শন না হয়, তবে তো মুস্কিল। ভুলে যেও না তোমরাই সেই বীজ। তোমরা যে সে বীজ নও, ভুলে যেও না। ভগবানের ভগবৎ সত্তা, ভগবৎ প্রেম আমাদেরই মাঝে অন্তর্নিহিত। আমরাই বীজ হয়ে ফুটে উঠবো। আমরা সেই বিরাট বীজ হয়ে পড়ে আছি। আবার বীজ হতে অঙ্কুর হবে।

আমরা রোপন করা অবস্থায় আছি। ফুল ফল হয়ে আমরা আবার বাড়তে থাকবো। অনন্ত পৃথিবীর এই মহাক্ষেত্রে আমরা বীজ হয়ে পড়ে আছি। বীজমন্ত্রের স্ফূরণ হলেই গাছ হবে, ফুল হবে, ফল হবে। গাছ ফুল ফল হয়ে আস্তে আস্তে বেড়ে উঠলো। আমাদের মায়া, মোহ, কাম ক্রোধ আমাদের গাছেরই অঙ্গ হয়ে আমাদের গাছেরই অঙ্গ বেয়ে বেয়ে বইতে লাগলো। তার ভিতরে যে ফুল ফল হতে থাকলো, তা হচ্ছে বিবেক, বিচার বৈরাগ্য। লতা যেমন বেয়ে ওঠে, আমাদের দেশে লাউগাছ বাঁশ বেয়ে বেয়ে ওঠে। লাউ কাটবার সময় যেগুলি বেয়ে ওঠে, তা ফেলেই আসে, কেউ ওদিকে লক্ষ্য করে না। সেইরূপ আমাদের ছল বল কাম ক্রোধ লোভ মাৎসর্য, এইগুলি বেয়ে বেয়ে উঠতে থাকে সেই সিদ্ধি, মুক্তি নির্বাণ অনিমা লঘিমা, গরিমা, অন্তর্যামিত্ব, সর্বদর্শীত্ব ইত্যাদি। এই যে নানারকম ফুল ফল বের হতে থাকে, তখন ঐ কাম ক্রোধ লোভ ওগুলো দিয়ে বেয়ে উঠতে থাকে।

ভগবানের ভগবৎ সত্তা, ভগবৎ প্রেম আমাদেরই মাঝে অন্তর্নিহিত। আমরাই বীজ হয়ে ফুটে উঠবো। আমরা সেই বিরাট বীজ হয়ে পড়ে আছি। আবার বীজ হতে অঙ্কুর হবে।

মা কালী যদি রোজ বাড়ীতে আসতো, রোজ খেত ঘরে তবে আর দাম থাতো না। বিরক্ত হয়ে মা কালীকে বলতো, এই পিঁড়িটা নিয়ে বসো।

আমরা এইভাবে এগিয়ে চলছি। তবুও আমরা হারিয়ে ফেলেছি, কি জানি, কিভাবে হবে, কখন হবে? সকলেই চায়, যদি একটু দর্শন পেতাম, যদি একটু অনুভূতি পেতাম, তবে কতই না আনন্দ হতো। এই যে চাওয়া, এ কিসের চাওয়া? এ চাওয়াটা কেন চায়? মা কালী যদি রোজ বাড়ীতে আসতো, রোজ খেত ঘরে তবে আর দাম থাকতো না। বিরক্ত হয়ে মা কালীকে বলতো, এই পিঁড়িটা নিয়ে বসো। তিনি আসেন না, তাই আমরা পুজো টুজো করছি। জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে আমরা যেভাবে দর্শন, অনুভূতি চাইছি, মনে হয় যেন দেখার অভ্যাস আছে বলেই দেখতে চাই। কেন চাইছি, জানি না। তারপর ভাবে যদি দেবদেবীদের সাথে কথা বলতে পারতাম। চিনি, গুড় আর সরবত খাওয়ার মত, মনে হয়, এটাও বোধহয় সেইরূপ। তাঁরা (দেবতারা) আসলেন, বসলেন, বর চাইলাম আর 'তথাস্তু' বললেন। কতকগুলো আছে, দেখলে অন্ধ হয়ে যায়। এটা জানলে আর চাইতো না। চাওয়াটা যে কি, এটা কি এমনি চাওয়া? দেখলে অন্ধ হয়ে যাবে, যদি জানতো, তাহলে কেউ চাইতো না। যে যে অনুভূতি বা দর্শনের জন্য সকলের আকাঙ্খা, তা উচিতের ভিতর পড়ে না। এই যে চাওয়া, কি চাইবে? কাকে চাইবে? কতবড় সাগর, বিরাট সাগর পড়ে আছে। পিপাসায় প্রাণ যায়, তবুও এক গ্লাস জল খেতে পারে না। খেতে দিলে থুঃ থুঃ করে ওটা ফেলে দেয়। বালতিতে দড়ি বাঁধলাম। কুয়া থেকে জল তুললাম।

সূর্য দেখারই জিনিস। কিন্তু এত বিরাট সূর্য, যা থেকে সৃষ্টি হলো, দেখতে পারি না তাকে, ছাতি আড়াল করে চলেছি। তাকাতে পারি না। তাকালে চোখ খারাপ হয়ে যায়। প্রত্যেকটি বিরাট বস্তুই আমরা অন্য আকারে পাই। ভগবানের ভগবত্তা, এই মরুভূমিতে, দেহেতে বিরাট আকারে পড়ে আছে। এই যে খুঁট খুঁট Pump করে যাচ্ছে, ঠাকুর্দ্দার আমল হতে আরম্ভ করে নাতি পুতি পর্যন্ত খুঁট খুট করেই চলেছে; জল উঠছেই। বিশ্ববিরাটের সত্তা এমন একটি স্বাদ, এমন একটি সুর, এমনি খুঁজলে পাওয়া যায় না। তোমাকে যদি মধু খেতে বলে, ফুলে মধু আছে, ফুল হতে যদি মধু টানতে যাও, ফু ফু করলে মধু আর পেলে না। সেই ফুল হতে মধু টানতে হলে মধুকরকে পাঠিয়ে দাও। তারপর তুমি মৌচাকে গেলে তখন মধু পেলে। ওই মধু আনতে গেলে সোজাভাবে আনতে পারে না। দুই একটা কামড়ও খেতে হয়। আমাদের এই বিরাট মধুময় জগতে মৌচাকটি কোথায়? মধুকরের শুঁড় কোথায়? ফুল ফুটে আছে পরিদৃশ্যমান জগতে, যেখান হতে সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহ করার শুঁড় আছে প্রত্যেকের ভিতরে। আমাদের ভিতরে শুঁড় আছে। আমরা সেই শুঁড় দিয়ে মধু টানবো। আমি একবার বাবার সাথে গেছি। দেখি, ইয়া লম্বা হাতীর শুঁড়ের মতো শূন্য হতে পড়লো। সেই হাতীর শুঁড় সব জল নিয়ে গেল, সব খালি করে নিল। দেখা গেল, বাষ্পের শুঁড়; ধুম্রাকারে যদি শুঁড় হয়ে থাকে, তবে সূর্য যখন জল টেনে নেয়, পুকুর নদী থেকে জল টেনে নেয়, সেই শুঁড়কে দেখা যায় না কেন? এটা হল অদৃশ্যের শুঁড়।

প্রত্যেকটি বিরাট বস্তুই আমরা অন্য আকারে পাই। ভগবানের ভগবত্তা, এই মরুভূমিতে, দেহেতে বিরাট আকারে পড়ে আছে।

অগণিত পৃথিবী আছে। এক পৃথিবীর সঙ্গে আবার অন্য পৃথিবীর সম্পর্ক আছে। পৃথিবীরও মা আছে, ভাই আছে, বোন আছে। তাদের মধ্যে যোগাযোগ আছে।

আবার আর একটি শুঁড় আছে, শব্দের শুঁড়। শব্দ দ্বারাই টেনে নিয়ে আসে। ভাব, শব্দ, মন একত্র হয়েই ভাবপ্রবণতার সৃষ্টি হয়। প্রত্যক্ষতার ভিতর দিয়ে যে শব্দ, যে শব্দ হতে সূর্য সৃষ্টি হয়েছে, সেই শব্দের সুরই আমাদের সুর। সেই মন্ত্রকে মন্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয়েছে। সেই শব্দকে (মন্ত্রকে) আশ্রয় করলে আমরা সবকিছু আয়ত্ত করতে পারি। এই যে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ আপন আপন ব্যবধানে থেকে, আপন আপন কক্ষে থেকে

প্রতিটি প্রতিটির সঙ্গে যোগাযোগ সূত্রে আকর্ষিত হয়ে রয়েছে, এরও একটা সুর আছে। এই সুরের ভিতর থেকেও প্রত্যেকে যার যার সুরের কাজ করে যাচ্ছে। সকল পৃথিবীর ভিতরই এরকম জল, বাতাস; সবটার ভিতরই একসুর বয়ে যাচ্ছে। অগণিত পৃথিবী আছে। এক পৃথিবীর সঙ্গে আবার অন্য পৃথিবীর সম্পর্ক আছে। পৃথিবীরও মা আছে, ভাই আছে, বোন আছে। তাদের মধ্যে যোগাযোগ আছে। তারা নেমন্তন্ন খায়। সেখানেও ভোটাভুটি আছে। কাটাকাটি, মারামারি, ফাটাফাটি চলছে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের। আবার প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সহযোগিতা আছে। আমাদের ভিতর যে বীজাণুর মারামারি, চলেছে, আমরা কিভাবে টের পাই। আমাদের মধ্যে অগণিত বীজ আছে। তাদেরও সবকিছু আছে। অগণিত পৃথিবীর সাথে অগণিত পৃথিবীর যোগাযোগে কোন্ সাহায্য কিভাবে দিচ্ছে, সেটাই জানতে হবে। আমাদের সঙ্গে যে যোগাযোগ, সেটা ওই যোগাযোগেরই যোগ। এই যোগ আজও চলেছে। এই যোগ অভ্যাস কিভাবে করে যাচ্ছে?

অনন্ত বিশ্বের সুরটাই হচ্ছে শব্দ, সেটাই মন্ত্র। সেটাই আমরা স্মরণ করছি। পৃথিবী ঘুরছে শব্দকে আশ্রয় করে। ভোঁ ভোঁ করে ঘুরছে। ঘুরে জ্বলে উঠছে শব্দ ও তেজ একই সমন্বয়ে।

অনন্ত বিশ্বের সুরটাই হচ্ছে শব্দ, সেটাই মন্ত্র। সেটাই আমরা স্মরণ করছি। পৃথিবী ঘুরছে শব্দকে আশ্রয় করে। ভোঁ ভোঁ করে ঘুরছে। ঘুরে জ্বলে উঠছে শব্দ ও তেজ একই সমন্বয়ে। তেজও যা, শব্দও তা। যে তেজ, যে শব্দ, সেটাই নাদ। একে আশ্রয় করে আমরা স্মরণ করছি সেই শব্দকে, যাতে এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। অন্যান্য গ্রহ, উপগ্রহকে আমরা যেমন বাতির মত, হীরার মত জ্বলতে দেখছি, এরাও আমাদের সেইরূপ দেখছে। শব্দের সঙ্গে সমন্বয়ে গতির গতিতে বিভিন্ন শব্দ যখন একত্রিত হয়, সেই শব্দকে মনন করার সাথে সাথে দুটো বস্তুর আকর্ষণে বিকর্ষণে যে জ্যোতির সৃষ্টি হয়, তাতেই আলো জ্বলে ওঠে। সেই তেজই আমাদের আধার (আশ্রয়)। সূর্য তার কক্ষ থেকে তার অগ্নিকুণ্ডে প্রজ্বলিত তেজোরাশি ছড়িয়ে রেখেছে। সেই তেজ যখন আমাদের ভিতর জ্বলে উঠবে এই সহস্র ধারাতে, তখন অগণিত সূর্যের রশ্মির মত ফুটে উঠবে। আমাদের মধ্যে সেই তেজ জাপ্য অবস্থায়, সাধারণ অবস্থায় রয়েছে। আমরা কচ্ছপের ন্যায় গুটিয়ে আছি। সমস্ত জীবের ভিতরই যেন গুটিয়ে থাকে সেই কচ্ছপ। কচ্ছপও অবতার। কচ্ছপ যদি অবতার হতে পারে, কচ্ছপ যে

কোন মুহূর্ত্তে ছুটতে পারে। অবস্থা ক্ষেত্রে আমরা গুটিয়ে আছি সেই মাতৃগর্ভে, সেই আসনে, যোগাসনে।

গর্ভে ব্যথায় যন্ত্রণায় বহির্গত হবার জন্য হাত পা ছুঁড়ে মাতৃগর্ভ হতে যখন বহির্গত হলাম, তখনই শুরু হল ওঁয়া ওঁয়া। এই শব্দধ্বনির মাঝেই আছে নিনাদের সুর। সেই যে হাত পা ছুঁড়তে আরম্ভ করলো, তাতে যোগীর যোগিত্ব একটুও নষ্ট হয় নাই। জলে পড়লে হাত পা ছোঁড়ে বাঁচবার জন্য। সেটা যেমন বাঁচতে চায়, তেমনি আমরা এই মহার্ণবে (সংসারে সমুদ্রে) হাত পা ছুঁড়ে বাঁচবার জন্য যে অগ্রসর হচ্ছি, তা ডুবে যাওয়ার জন্য নয়, মরবার জন্য নয়। আমাদের এই গতি সেখানে যাবার জন্য, সেই পরপারে যাবার জন্য। সেই পারে গেলে সব জানা হয়ে যায়। আমরা এই বিরাট সাগরে হাবুডুবু খেয়ে যে অগ্রসর হচ্ছি; রোগ, শোক, দুঃখ যন্ত্রণায় ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য যে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ছি, সেটা আর কিছু নয়। এমন একটি দেশে পৌঁছাবার জন্য আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, যেখানে গেলে সব জানা যায়, সব বুঝা যায়। সেই দেশই আমাদের দেশ। কেহ আগে যায়; কেহ পরে যায়। কেহ কেহ সেখানে পৌঁছে গেছে। কেহ ২০ মাইল দূরে, কেহ বা এক মাইল দূরে। কেহ কাহারও ছাড়া নয়। সবাই একই স্কুলের ছাত্র। আমরাও যাচ্ছি সেই ধারায়, যে ধারাকে ধরলে সব ধারা জানা যায়। সেখানে গেলে সব জানা যায়, বুঝা যায়। যে দেশে গেলে অন্তর্যামিত্ব, ঈশিত্ব, বশিত্ব, সর্বশক্তিমত্তা, সর্বদর্শিত্ব সবকিছু পাওয়া যায়, সেই দেশ হচ্ছে অনাহতে, সেই দেশ হচ্ছে আজ্ঞাচক্রে, সেই দেশ সহস্রারে। সেই দেশ অন্যত্র নয়। সেই দেশ পৃথিবী ছাড়া নয়। সেখানে স্বর্গমর্ত্ত্যের কথা শুনে এসেছ, সপ্তলোকের কথা শুনে এসেছ, এই ভূর্ভুবঃস্বঃ সেই লোক। এই লোক এই দেহক্ষেত্র ছাড়া নয়। এই পঞ্চভূতের দেহে, এই দেহক্ষেত্রে রয়েছে সপ্তস্তরের সপ্তধ্বনির কুলকুণ্ডলিনীর কথা। সেখানে গেলে ভগবানের ভগবৎসত্তা সব জানা যায়, বুঝা যায়। সেই দেশ হচ্ছে এই মহান দেশ (এই দেহবীণাযন্ত্র)। আমরা হাতড়ে হাতড়ে চলছি বৃত্তির নিবৃত্তি করতে। এই অনুভূতির দরজা হচ্ছে বৃত্তির নিবৃত্তি।

এমন একটি দেশে পৌঁছাবার জন্য আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, যেখানে গেলে সব জানা যায়, সব বুঝা যায়। সেই দেশই আমাদের দেশ। কেহ আগে যায়; কেহ পরে যায়। কেহ কেহ সেখানে পৌঁছে গেছে। কেহ ২০ মাইল দূরে, কেহ বা এক মাইল দূরে।

সৃষ্টির এমনই রহস্য যে পূরণ হয় না। এই নিবৃত্তি আজও হয়নি বলে আমরা পূরণের জন্য এগিয়ে যাচ্ছি। পূর্ণকে পূর্ণভাবে পাওয়ার জন্য, যে পূর্ণ পরিপূর্ণভাবে আমাদের মধ্যে রয়েছে, তাকেই পূর্ণ করতে আমরা সেই পরিপূর্ণেরই সাধনা করছি। ক্ষেতীরা করে কি? ফাঁকা জায়গা দেখলে বীজ ছিটিয়ে ছিটিয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্র এমন (ফাঁকা) পড়ে আছে। তারা একটু ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। দেশের এমন অবস্থা ধর্মের নামে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই চলেছে ব্যবসা। তাদের কাছে দীক্ষা নিতে এই সেই, টাকা পয়সা কত কি লাগে। সাধারণ গরীব মানুষের পক্ষে এতসব দিয়ে দীক্ষা নেওয়া সম্ভব নয়। একশ্রেণীর ধর্মব্যবসায়ী ধর্মের নামে মানুষের সেন্টিমেন্টের সুযোগ নিয়ে পরগাছার মত সমাজটাকে শুষে নিচ্ছে। দীক্ষার যে প্রচলিত নিয়ম এখানে আছে, দিনে দু'চারজনের বেশী হয় না, সেটা ঠিক নয়। আমার কাছে দীক্ষা নিতে টাকাকড়ি কিছুই লাগে না। দিল (মন) দক্ষিণাই যথেষ্ট। আমি ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে সবার মাঝে বিলিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। দুর্গতকে জাগিয়ে দেওয়াই আমার কাজ।

একশ্রেণীর ধর্মব্যবসায়ী ধর্মের নামে মানুষের সেন্টিমেন্টের সুযোগ নিয়ে পরগাছার মত সমাজটাকে শুষে নিচ্ছে।

অনেকের মনে ধারণা আছে, মানুষ হলেও তারা নিকৃষ্ট জাত। তাদের জানিয়ে দিতে হবে যে, জাতে তোমরা ঠিকই আছ। নির্যাতন করে তোমাদের দাবিয়ে রেখেছে নিজেদের সুবিধার্থে। তাদের ভিতর যদি একটু সত্যিকারের জাগিয়ে তুলতে পারি, সেটাই হবে সাধনা। সকলকে একটা সুরে আনা প্রয়োজন। আমার নীতি হচ্ছে vaccination নীতি। সকলকার ভিতরে vaccine দিয়ে দিয়ে জাগিয়ে যদি তুলতে পারি, সেই জাগরণের সুর বৃষ্টিধারার ন্যায় সকলকার ভিতর এক ফোঁটা এক ফোঁটা যদি দিতে পারি, তবেই দেশ ভেসে যাবে। তা হতে এক জ্ঞান, এক সুর, এক প্রেম, এক জাতি, এক নীতি গড়ে উঠবে। সেই সাম্যের সুরেই দেশকে গড়া প্রয়োজন। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

সজাগ যেখানে গুরু সেখানে

পাম এ্যাভিনিউ

৬ই জুন, ১৯৬৫

শ্রীশ্রী ঠাকুর — কিছু জিজ্ঞাসা করবে নাকি? কই হে?

বি. রায় — আজ্ঞে, শব্দের রূপ ও প্রকৃতি এবং মায়াবাদ সম্বন্ধে যদি কিছু বলেন।

শ্রীশ্রী ঠাকুর — এস. উঠে এসে জিজ্ঞাসা কর। জানার বাকী আছে নাকি কিছু?

বি. রায় — আজ্ঞে, সবইতো বাকী। কিছুইতো জানা যায়নি। মায়াবাদ সম্বন্ধে জানার আগ্রহ হচ্ছে। কৃপা করে যদি বলেন।

শ্রীশ্রী ঠাকুর — মায়াবাদ সম্বন্ধে জানতে চাইছো? বেশ।

মায়াবাদ

মায়াবাদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে। বলার বিশেষ কিছু নাই। মায়া কামকাঞ্চন যেটাকে বর্জন করা সমীচীন বলে অনেকে মনে করেন। কারণ এটা নাকি আধ্যাত্মিক বাদের অন্তরায়। কিন্তু মায়া হচ্ছে আকর্ষণ। এই আকর্ষণ না থাকলে এই পৃথিবীতে কোন কিছুর সাথেই যোগাযোগ থাকতো না। এই যে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকে এক আকর্ষণের যোগাযোগসূত্রে গাঁথা। সংসারের প্রতিটি বস্তুর মাঝে এমন আকর্ষণ আছে, যে আকর্ষণের মাধ্যমে প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের যোগাযোগের সূত্র ধরে এক একটি নতুন রূপের সৃষ্টি হচ্ছে। যত বৃত্তি আছে, ইন্দ্রিয় আছে, ঐ আকর্ষণের মধ্যেই আছে। আকর্ষণ এক জাতীয় মায়া। এই মায়া ‘বর্জন’ যেটাকে বলা হয়, তার মধ্যে পড়ে না। সেটুকুই বর্জন করার কথা বলা হয়, যেটা মাত্রা ছাড়িয়ে চলে যায়। মাত্রা মাফিক চললে ‘বর্জন’ করার কথা আসে না। সূর্যের দিকে তাকিয়ে কেহ হাঁটে না। যেহেতু সূর্য আমাদের ভাল করেন, তুমি যদি তাঁর দিকে চেয়ে থাক, চক্ষু নষ্ট হয়ে যায়। এই ইন্দ্রিয়গুলো যতটুকু আছে, আকর্ষণের যতটুকু দরকার, ততটুকুই প্রয়োজন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলেই বর্জন। তার বেশী নিলেই ক্ষতিকারক। এতটুকু খেলে যদি হয়, প্রয়োজন মিটে যায়, তার চেয়ে বেশী খেলে হজমে ব্যাঘাত ঘটে। ধর, ধোঁয়া যারা খায়, এটা না খেলেও চলে। কিন্তু জোর করে প্রয়োজন তৈরী করে আমরা ভাল লাগিয়ে নিচ্ছি। এটার ফল ভাল হয় না। এই আকর্ষণ, এই মায়া সবকিছুর মধ্যে আছে। যেখানে বাতাস আছে, যেখানে জল আছে, যেখানে মাটি আছে, যেখানে তাপ আছে, যেখানে সূর্য আছে, তা হতে যে সৃষ্টি হচ্ছে, প্রত্যেকেই সেই আকর্ষণে রয়েছে। প্রত্যেকের আকর্ষণের সাথে প্রত্যেকে জড়িত।

মায়া কামকাঞ্চন যেটাকে বর্জন করা সমীচীন বলে অনেকে মনে করেন। কারণ এটা নাকি আধ্যাত্মিক বাদের অন্তরায়। কিন্তু মায়া হচ্ছে আকর্ষণ। এই আকর্ষণ না থাকলে এই পৃথিবীতে কোন কিছুর সাথেই যোগাযোগ থাকতো না।

নারদ যে মহামায়ার ফাঁদে পড়েছিল, সেটা আলাদা কথা, সে গল্প। আর প্রকৃতির যে মায়া, এর মধ্যে আমরা সবাই জড়িত আছি। আধ্যাত্মিক চিন্তার উপর যে সত্যবস্তুকে দেখতে চায়, জানতে চায়; তার চেয়ে ঊর্দ্ধে আরও কি আছে, তাও যে জানতে চায়, তাকে সিঁড়ির উপর দিয়ে যেতে হয়। আমাদের সেই সিঁড়ির উপর দিয়ে যেতে হবে। রাবণ স্বর্গে যাবার জন্য সেই সিঁড়ি তৈরী করতে চেয়েছিল। তার আর দরকার হয় না। ধুলো ওড়ে, পাখী উড়ছে, উঠার জিনিস আছে বলেই উড়ছে। সেইরূপ অনন্ত সিঁড়ি আছে। আমরা যদি যাওয়ার রাস্তা ঠিক করে নিই, বহুদূর চলে যাওয়া যায়। সিঁড়ি দিয়ে না যেয়ে যদি নল বেয়ে যেতে হয়, তবে বড় মুস্কিল। কুপথকে পথ বলা যায় না। কুপথকে উদ্দেশ্য করে যেটা থাকে, তাকে মায়া বলে, সেটুকু বর্জন করা উচিত।

সিঁড়ি দিয়ে না যেয়ে যদি নল বেয়ে যেতে হয়, তবে বড় মুস্কিল। কুপথকে পথ বলা যায় না। কুপথকে উদ্দেশ্য করে যেটা থাকে, তাকে মায়া বলে, সেটুকু বর্জন করা উচিত।

আমাদের এখানে সিঁড়ি এমনি পড়ে থাকে। আর ঐ সিঁড়ি যদি ব্যস্ত হয়, ‘তোমরা এস, আমার উপর দিয়ে ওঠো, তাহলে কেমন হয়?’ যেমন রিক্সাওয়ালা বলে ‘আসুন, আসুন’। সিঁড়ির নিজস্ব সত্তা দেখা যায়। তার

দেহ, মন, জগৎ এমনভাবে গড়া বা গঠন হয়ে রয়েছে যে, বিশ্বের সত্তার অস্তিত্বের অস্তিত্বকে কিভাবে জানা যায়, ভিতরকার সুরকে, অন্তর্নিহিত সত্তাকে কিভাবে জানা যায়, বুঝা যায়, সেই হদিশ দিয়ে সেইভাবেই যেন সবকিছু তৈরী।

নিজস্ব সত্তা আছে, নিজস্ব বুদ্ধি আছে। সিঁড়ি বলছে, 'সপ্তলোকে চলো, নির্বিকল্পে চলো, সিদ্ধির জায়গায় চলো'। প্রাণবায়ু, এই প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান এমন টান দিচ্ছে, প্রাণের সম্পর্ক নিয়ে যে টানাটানি করছে; শেষটান পর্যন্ত টান দিয়ে নিয়ে যায়, সিঁড়ি হচ্ছে এমন সুন্দর। এই যে পাকিস্তানে (বাংলাদেশে) ঝড় বন্যা হলো, সব সিঁড়িরই খেলা। সে বলছে, আমি মরে যাইনি। আমি এখনও আছি। সব কিছুকে সজাগ করে দিচ্ছে। এই সিঁড়ি আমাদের মধ্যে আছে। দেহবীণাযন্ত্রের প্রতি স্তরে স্তরে ধমনীতে ধমনীতে শিরায় উপশিরায় এমন সুসজ্জিতভাবে রয়েছে যে, প্রতি স্পর্শে স্পর্শে দর্শনে সিঁড়ির সেই অনুভূতি হয়। প্রতি লোমকূপ দিয়ে তার অনুভব করতে হয়। যে অনুভূতিতে মানুষ জানতে চায়, সেটা এই সিঁড়িরই অনুভূতি। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা সব সজাগ। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বিশ্বের সত্তাকে প্রতিক্ষণে অনুভব করে চলেছে। অনুশক্তি থেকে এসেছে মায়া বা আকর্ষণ। যোগাযোগ সূত্র ছিল বলেই এই আকর্ষণ বহুমুখী হয়ে প্রকাশ করছে। এই বস্তুর বস্তুত্বকে জানাই হচ্ছে কাজ। দেহ, মন, জগৎ এমনভাবে গড়া বা গঠন হয়ে রয়েছে যে, বিশ্বের সত্তার অস্তিত্বের অস্তিত্বকে কিভাবে জানা যায়, ভিতরকার সুরকে, অন্তর্নিহিত সত্তাকে কিভাবে জানা যায়, বুঝা যায়, সেই হদিশ দিয়ে সেইভাবেই যেন সবকিছু তৈরী। বিশ্বের সত্তাকে যাতে গভীরভাবে জানা যায়, তার জন্যই যেন দেহের প্রতিটি গ্রন্থি এমনভাবে তৈরী। আদিসুরকে জানার জন্যই এই শিরা উপশিরাগুলি এমনভাবে গড়া। আমরা সেভাবে বুঝতে চাই না। যে বুঝটুকুনু আসে, তাও মনে গাঁথে না। আমরা ক্ষণিকের তাগিদে ইন্দ্রিয়ের যে বুঝটুকু বুঝেছি, তার জন্যই মারামারি করছি, লাফালাফি করছি। এই সাময়িক ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির জন্য আমরা উঠে পড়ে লেগেছি। আর অন্য যে ইন্দ্রিয়গুলো গভীরভাবে রয়েছে, সেগুলো মরিচাতে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। যেটা কাজে লাগানো না যায়, তাতেই মরিচা পড়ে যায়। আমাদের দেহযন্ত্র যে বিশ্বের সমস্ত সত্তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে, বিরাটের সেই সুরকে আমরা কাজে লাগাইনি। সমূহ যেটার স্বাদ পাওয়া যায়, তার মধ্যেই আমরা ঝাঁপিয়ে

পড়েছি। এই যে ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা, এরজন্য জগতে কত মারামারি, কাটাকাটি, কত কলঙ্ক। প্রতি বস্তুতে বস্তুতে আকর্ষণ এমনভাবে জড়ানো, বিশ্বের সত্তাটা কণায় কণায় এমনভাবে যুক্ত হয়ে রয়েছে যে বেশীরভাগই ঘূর্ণীপাকের বিভ্রান্তিতে পড়ে হাবুডুবু খেতে থাকে।

দুনিয়াতে কেহ সেধে কারও উপকার এমনি করে না। মা সন্তানকে স্তন পান করায় তার নিজস্ব তাগিদে। একজনের বৃত্তির নিবৃত্তিতে আর একজনের সৃষ্টি।

উপায় না দেখে ছাড়াছাড়িতে না গিয়ে একবারে যেতে হলে সমস্ত কিছু বর্জন করতে হবে, এই যে বিধি, তাতে সমস্ত কিছু বর্জনও হয় না, কাজও হয় না। পৃথিবী যে ঘুরছে, সে কি কারও উপকার করতে ঘুরছে? পৃথিবী স্বাভাবিকভাবে তার নিজস্বগতিতে ঘুরছে, তা অন্যের উপকারে লেগে যাচ্ছে। দুনিয়াতে কেহ সেধে কারও উপকার এমনি করে না। মা সন্তানকে স্তন পান করায় তার নিজস্ব তাগিদে। একজনের বৃত্তির নিবৃত্তিতে আর একজনের সৃষ্টি। বিশ্বের সত্তা এমনই আপনিই নিজস্ব সুরে চলছে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে যোগাযোগসূত্রে কাজ করে যাচ্ছে। একজন আর একজনের উপকার করে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে একজাতীয় ভাষা। প্রয়োজনের তাগিদেই সব হয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, আমাদের মৃত্যুটা কেউ আটকাতে পারছে না। কথা হচ্ছে, আটকাবো কোথায়? 'তুমি ঐ বাড়ী যেও না। তুমি ওখানে যাবে না, আমি পছন্দ করি না', ইত্যাদি আমাদের ক্ষমতা ঐটুকু। কিন্তু শেষ সময়ে, 'ডাক্তারবাবু কি হবে? আমার ছেলে ভালো হবে তো?' মৃত্যুকে কেহ রোধ করতে পারছে না তো। মৃত্যু রোধ করতে পারছে না, অসুখ রোধ করতে পারছে না। বাধা দিচ্ছে কোথায়? যেখানে দ্বন্দ্ব হতে পারে, বিবাদ হতে পারে, সেক্ষেত্রে সাময়িক বারণ করে, সাময়িক আটকাতে পারো। কিন্তু পুলটিশ (তালি) দিয়ে কাজ হয় না। ভিতর থেকে যে উঁকিঝুঁকি (বৃত্তির তাড়না) তা কিভাবে বারণ করবে? এই উঁকিঝুঁকিকে বারণ করা যায় না। যা চলেছে সরকারে, ইচ্ছামতন আটক করছে। ক্ষমতার অপব্যবহার ততক্ষণ থাকে, যতক্ষণ তারা ঐ ব্যাপারে থাকে। যারা নিজস্ব সত্তার সঙ্গে জড়িত, তাদের অন্তরে তাঁর (স্রষ্টার) আদেশ, তাঁর উপদেশ, তাঁর কর্ম, তাঁর বাণী এমনভাবে গেঁথে থাকবে যা সত্যিকারের সুর হতে নেমে আসে। আর এখানে

আমাদের পজিশন, প্রেস্টিজ, স্বার্থ ব্যক্তিগত রাগ, অভিমান, হিংসা, দ্বেষ দিয়ে যে আর একজনের উপর আধিপত্য খাটাতে যাচ্ছি, এতে বিষক্রিয়া হয়ে যাচ্ছে। ঐ ইঞ্জেক্সনটা আর্সেনিকের মত দেহের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে যাচ্ছে। কই আমিতো (ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ) কাউকে কিছু ছাড়তে বলি না। প্রকৃতির নিয়মে সবাই ছাড়তে ছাড়তে চলে যাচ্ছে। আমি এমন একটা জিনিস দিয়ে রেখেছি, আপনিই সব ছেড়ে যাবে। এমনিই যখন ছেড়ে যাচ্ছে, আর ছাড়াছাড়ির কথা বলে লাভ কি? শিশু এতটুকু বয়স থেকে এমনিই ছেড়ে বার্ধক্যের পথে চলে যাচ্ছে। তার সাথে সাথে সবই ছেড়ে যাচ্ছে। এটাই যখন নিয়ম বলার আর প্রয়োজন নাই। প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী এই যে সূর্য নিত্য উঠছে আপনমনে, সে কারোর কথায় চলে না। সেই সূর্যের মন যখন আছে, সূর্যে বৃত্তি যখন আছে, তার স্ফূরণ হবে না? প্রকৃত প্রস্তাবে না বুঝে কেহ কোন অন্যায় করে না, অবিচার করে না। কেন করে না? যে অন্যায় করতে যাচ্ছে, সে যখন বুঝতে পারছে, অনুতপ্ত হচ্ছে। অনুতপ্ত হলে আর অন্যায় থাকে না। সুতরাং সূর্যের স্ফূরণ যেটা, তাতে যার যার অন্যায় সেতো বুঝতে পারছে। আমি সাধু সাজলাম, তুমি আমার কাছে এসে চোর বা সাধু বললে, তাতে কি হলো? তোমার কাছে তুমি সাধু কিনা সেটাই আগে তাকিয়ে দেখ। তুমি তোমার কাছে ঠিক থাকলেই হলো। যে যাই অন্যায় করবে, প্রতিমুহূর্তে সাড়া দিয়ে যাবে। চৈতন্যের যন্ত্রগুলো সজাগ বলে আকর্ষণ বা মায়ার দ্বারা জানিয়ে দিচ্ছে, তুমি যা করতে যাচ্ছ, তা ঠিক নয়।

এখানে আমাদের পজিশন, প্রেস্টিজ, স্বার্থ ব্যক্তিগত রাগ, অভিমান, হিংসা, দ্বেষ দিয়ে যে আর একজনের উপর আধিপত্য খাটাতে যাচ্ছি, এতে বিষক্রিয়া হয়ে যাচ্ছে।

যে অন্যায় করতে যাচ্ছে, সে যখন বুঝতে পারছে, অনুতপ্ত হচ্ছে। অনুতপ্ত হলে আর অন্যায় থাকে না।

একটা শিশুর কাছে কোন কিছুরই মূল্য নেই। শিশু কাঁচের টুকরো, হীরের টুকরো, দুই ফেলে দেয়। শিশু বরফে হাত দিচ্ছে, আগুনে হাত দিচ্ছে। তার কাছে বরফও যা, আগুনও তা। শিশুর এমন একটি অবস্থা, সে পৃথিবীরপ্রথম অবস্থায় আছে। পৃথিবী যখন গলিত মাটি হয়ে এল, তখন সবই গলিত অবস্থা। মাটি আছে, জল আছে, সব আছে, আবার কিছুই নেই। পৃথিবীর সেই ইঙ্গিত শিশুর মধ্যে। তার কিছুই খেয়াল নাই। খেয়াল নেই বলে শিশু বোকা নয়। কারণ পৃথিবীর গলিত অবস্থার ন্যায় ঐ অবস্থা কেন? সেটা তৈরী হওয়ার জন্য। শিশু তৈরী হবে। জ্ঞান তৈরী হবে, মানবতা তৈরী হবে, সুর তৈরী হবে। শিশুর পাত্র ঐ যে গলিত অবস্থার, তাকে কাঁচা অবস্থাই বল, যাই বল, ঐ অবস্থায় সবই আছে তৈরী হওয়ার জন্য। গলিত অবস্থার আকর্ষণে পুরো মায়াটা আছে। তার মধ্য থেকে অপরূপ রূপ নিয়ে বেরোচ্ছে। আজও তোমাদের সেই অবস্থা আছে। কোন্‌টা ন্যায়, কোন্‌টা অন্যায় তুমি বুঝতে পার। তুমি নিজে বুঝতে পার, নিজের বুঝ যখন পাকা থাকে। এই বুঝতে পারাটা তোমার নয়, অনন্ত সত্তা থেকে তোমায় জানিয়ে দিচ্ছে। তোমাকে প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে নির্দেশ দিচ্ছে তোমার দিগ্‌দৃষ্টির পথে। তুমি যাতে দিগ্‌দৃষ্টি ঠিক করতে পার, প্রকৃতিই তার কাঁটার নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে। কাঁটা উত্তরদিকে চলে যায়, কেননা চুম্বক রয়েছে সেদিকে। তোমাদের সে কাঁটা চৈতন্যের সজাগ হতে এককণা নড়চড় হয় না।

যতই উন্মাদের মত চল না কেন প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে সজাগওয়ালা তোমাকে সজাগ করে দিচ্ছে, ‘সাবধান, সাবধান’। মাঝে মাঝে অবস্থার প্রভাবে তুমি যদি সেই সাবধানবাণী মেনে না চল সাময়িক, তাতে যে ক্ষতি হবে, তারজন্য তুমি দায়ী। সজাগের যে প্রভাবে বেশীরভাগক্ষেত্রে এগিয়ে যায়, তেমনি আবার সাময়িক পরিবেশের প্রভাব এমন বড় হয়ে যায় যে, কাঁটা যতই ঘুরিয়ে চলতে চেষ্টা করি, ঐ প্রভাব হতে ঘুরবে না। প্রতি মুহূর্তে বিশ্বের সুর তোমাদের হুঁশিয়ার করে দেবার জন্য এমন একটি কাঁটা দিয়েছে। আমরা যদি ঐ সজাগের আকর্ষণের সহিত নিজেদের আকর্ষণ বা ঐ মায়ার সহিত নিজেদের একসূত্রে বেঁধে রাখি, গেঁথে রাখি, তাহলেই হয়ে গেল। যিনি এভাবে কাজ করবেন, তাঁকেই মহান আখ্যা দেওয়া যায়। ঐ সজাগওয়ালা সবাইকে সজাগ করে দিয়েছেন। তিনি যদি নিজের জীবনে এক করে নেন, তিনিই হলেন মহান। তিনিই হলেন ভগবান। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যে যা কিছু, সব যদি সেই কাঁটার সহিত এক কাঁটা করে নিই, তবে আমাদের পক্ষে সব সহজ হয়ে যায়।

যতই উন্মাদের মত চল না কেন প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে সজাগওয়ালা তোমাকে সজাগ করে দিচ্ছে, ‘সাবধান, সাবধান’। মাঝে মাঝে অবস্থার প্রভাবে তুমি যদি সেই সাবধানবাণী মেনে না চল সাময়িক, তাতে যে ক্ষতি হবে, তারজন্য তুমি দায়ী।

ভগবানের ভগবত্তার সাথে যুক্ত হয়ে যে চলতে পারে, তাকে অনেক লাঞ্ছনা, অনেক অপমান বাহ্যিক দিক দিয়ে সহ্য করতে হবে।

ভগবানের ভগবত্তার সাথে যুক্ত হয়ে যে চলতে পারে, তাকে অনেক লাঞ্ছনা, অনেক অপমান বাহ্যিক দিক দিয়ে সহ্য করতে হবে। হয়তো তিনি বিবেকের সুরে সুর মিলিয়ে চলতে গিয়ে তাঁর ভিতরে যে চিন্তা এসেছে, বলে দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে শুরু হয়ে গেল নানা কটুক্তি, ‘আপনি এরকম? মনে মনে ওরকম অন্যায় চিন্তা করেন কেন?’ সবলোক ভাবলো, তিনি কতবড় অপরাধ করে ফেলেছেন। তারা সবাই এটাই বলতে লাগলো। তারা ভুলে যায় নিজেদের ভিতরকার সজাগের কাঁটার কথাটা। আমরা যদি সূর্যমুখী ফুলের মতো সজাগের প্রতি দিগ্‌দৃষ্টি রেখে একমুখী হয়ে চলে যাই, এটাই গুরু। সজাগ যেখানে, গুরু সেখানে, সেখানেই মন্ত্র। তুমি গুরুগত প্রাণ হয়ে সেখানেই (সজাগের কাঁটাতেই) সেবা কর। প্রহ্লাদ জন্মেছিল দস্যুকুলে। প্রহ্লাদ হতে বেশীক্ষণ লাগে না। প্রহ্লাদ হরির দিকে মন রেখেছিল। হরিকে আমরা স্মরণ করি, তাঁকেই আমরা বরণ করি। মনের কাঁটা ঐ দিকেই (হরির দিকেই) রয়েছে। হরি হরণ করছে। বাপ দস্যু নয়। আজ সমাজ দস্যু হয়ে গেছে। তার জের আমাদের পোহাতেই হবে। জীবনের সীমাকাঠি হচ্ছে ৭০/৮০ বৎসর পর্যন্ত। তার মধ্যে এতকিছু খেলা সমীচীন হয় না। সাধারণতঃ ৪০ বৎসর পর্যন্ত অনেক কিছুর উপর দিয়ে যায়, ৫০ বৎসরের পর আর কিছু থাকে না।

আমাদের কথা হচ্ছে, শুধু নিজেকে সজাগ করে রাখ সেই সজাগওয়ালার কাছে। আর কিছু দরকার হবে না। রেডিওতে যেমন বলে; আমাদের এই দেহবীণাযন্ত্রের রেডিওতে বিরাট শক্তি অন্তর্নিহিত। বিশ্বস্রষ্টা দাঁড়িয়ে বলছেন, আমাদের শিরা উপশিরার মাধ্যমে। রেডিয়োর টিউনের মত যা বুঝের ভিতর দিয়ে প্রতিক্ষণে ক্ষণে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। মুখের ভিতরে চুল পড়লে জিহ্বা থুথু করে ফেলে দিল। চোখে না দেখে মুখে খাবার ঢুকিয়ে দিলে। চুল পেয়েই থু করে ফেলে দিল। তিতা পড়লেও থু। জিহ্বা যদি বলতো, তুমি দেখে দেবে। আমি যা পাব, খেয়ে নেব। জিহ্বা তাতো করে না, এমন সজাগের যন্ত্র জিহ্বার মধ্যে যে সাথে সাথে থু। চোখে ধুলাবালি পড়লে সেও তো বুঝে। এত সূক্ষ্ম অনুভূতি যে চিন্তা করা যায় না। বলা কওয়া বা দেখার আগেই চক্ষু যদি ধুলা হতে নিজেকে রক্ষা না করতো, তাহলে কি হতো? ধুলা ড্রেনে জমে যায়। চোখে এত ধুলা পড়লে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু সে নিজেই বুঝে বুঝে নিজেই নিজেকে রক্ষা করে। তোমার জানা অজানার জন্য অপেক্ষা করে না। কানের এখানে পিঁপড়া গেলে কি কেহ বলে দেয়? স্বাভাবিকভাবে হাত সেখানেই চলে যায়। কাউকে আর বলতে হয় না। নাকে যদি কিছু ঢোকে, দুর্গন্ধ যদি পায়, এমনি নিয়ম, এমনি কানুন আপনি নাকে কাপড় দেয়। এটা পচা গলা কাউকে আর বলতে হয় না। আর এক জিহ্বা (সজাগ) সাহায্য না করলে এই জিহ্বা (ইন্দ্রিয়) চলতে পারে না। এই জিহ্বার সাথে অনেক জিহ্বার যোগাযোগ আছে। এই চক্ষুর জন্য অন্য চক্ষু আছে, যার জন্য এই চক্ষু চলেছে। পাপ পুণ্য সর্ব অবস্থায় তোমাকে জানিয়ে দেয়। যত শিকারী শিকার করে খুশী হয়, ব্যথা-বেদনার সুর প্রতিক্ষণে ক্ষণে তাকে জানিয়ে দিচ্ছে। বাছুরকে যে দুধ না খাইয়ে দুধ দোয়া হচ্ছে, যে দুইছে সে ভালই বুঝতে পারে। আমার দরকার, তাই দুইছি (দোহন করছি), এই বলাটা ঠিক নয়। এই চলাটাও ঠিক চলা নয়। এটা হচ্ছে হুঁচোট খাওয়া। **যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের মনের সাথে ঐ কাঁটার সঙ্গে যুক্ত হতে না পারবে, এই দুইয়ের মাঝে অর্থাৎ আকর্ষণের মাঝে, এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে তোমার মনের সত্তার সাথে, বুদ্ধির সত্তার সাথে সজাগকে মিশিয়ে যতক্ষণ না চলবে, ততক্ষণ হুঁচোট খেতেই হবে বারবার। জন্ম নিতে হবে বারবার, ঘুরতে হবে বারবার।** মন্ত্র কি করে? এই জন্ম মৃত্যুর চক্র (ঘূর্ণীপাক) হতে মুক্ত করার ব্যবস্থা করে। এই যে বাতাস আছে, এই বাতাসে তৃপ্তি হয় না। তোমাদের তৃপ্তি হচ্ছে না। আরও বেশী দরকার; সেইজন্যই পাখা। মন্ত্র হচ্ছে এমন একটি পাখা, এমন একটি যন্ত্র যা ১০৮°/১৮৮° গরমের মধ্যে এমন একটি রেফ্রিজারেটর তৈরী করছে, যা ঐসব সাময়িক উপদ্রব নিবারণ করতে সাহায্য করছে। তোমার মনকে বিরাটের সাথে যুক্ত হতে সাহায্য করছে। তারপর সাধারণ বুদ্ধি একটু ন্যস্ত করে চলতে যদি পার, এত মধুর লাগবে, নিজের আনন্দে নিজে ডুবে থাকবে। আমরা এর বিপরীত পথে চলেছি। আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে এমন কাজ করে যাচ্ছি, যাতে ঐ কাঁটা হতে দূরে সরে যাই। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

শিব তোমাদের অতিথি। তাঁকে অভ্যর্থনা করবে না?

সুখচরধাম

২৮-০২-১৯৭৬

আজ শিবরাত্রি, শিবের জন্মদিন। শিব হলেন মঙ্গলময়। তোমরা আজ সেই মঙ্গলময়ের সাধনা করছো। তোমার মঙ্গল ও সকলের মঙ্গল কামনা করছো।

শিবের বুকের উপর যে কালী দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি শান্তির প্রতীক। শিবের ত্রিশূল শিবের সঙ্গে কথা বলতো। কারণ শিব নিজের বিবেকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতেন। তোমরাও ত্রিশূলের সঙ্গে কথা বলতে পারবে, যদি নিজেদের বিবেকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে চলো। শিব নির্জনে বসে জপ করতেন। শিব অষ্টসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। শিবের ত্রিশূল আমি নিজহাতে নিয়ে তোমাদের দিয়েছি। তোমরা তার মর্যাদা রক্ষা ক'রো।

শিবের ত্রিশূল শিবের সঙ্গে কথা বলতো। কারণ শিব নিজের বিবেকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতেন। তোমরাও ত্রিশূলের সঙ্গে কথা বলতে পারবে, যদি নিজেদের বিবেকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে চলো।

তোমরা সকলে এখন চোখবুঁজে মহাকাশে বিচরণ করছো, এই চিন্তায় গভীরভাবে থাকো। শিবই মহাকাশে নিয়ে যাবেন। শিব এখন কি করছেন তোমরা শোনো। এই কথাগুলো গভীরভাবে চিন্তা কোর। বেদমন্ত্র ....

তোমরা ক্ষণিকের তৃপ্তির জন্য সমাজে কত কি করে বেড়াচ্ছ। কত চিঠি লিখছো, কত পাপ করছো। কোটি সমান বড় অন্যায় কাজ করছো একটা তৃপ্তির জন্য, বীর্যপাত করছো। এরচেয়ে কোটি কোটিগুণ তৃপ্তি আছে সেখানে। ঐ বীর্য আছে মূলাধারের মূলগ্রন্থিতে। 'ও' (বীর্য) যখন স্বাধিষ্ঠানে যায়, তখন স্বাধিষ্ঠানে সন্তান সৃষ্টি করে। স্বাধিষ্ঠান হলো সন্তান সৃষ্টির ঘর। স্বাধিষ্ঠান থেকে যখন বীর্য মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ পার হয়ে আজ্ঞাচক্রে যায়, সেখানে আর এক সন্তান সৃষ্টি হয়। বীর্য আজ্ঞাচক্রে আসে যখন, ঐখানে হয় আর এক সন্তান সৃষ্টি। এইখানে পরম তৃপ্তি লাভ হয়। সেই সন্তান তখন মহাকাশ থেকে রাম নারায়ণ রাম ধ্বনি শুনতে পায়।

আমি শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে তোমাদের কাছে আমার একটি কথা বলবো। আমি তোমাদের নিয়ে যেতে চাই, যেখানে কোটি কোটি গুণ শান্তি আছে। সেখানে তোমরা যেতে চাও তো?

হ্যাঁ বাবা, আমরা যেতে চাই। আমাদের তুমি নিয়ে চলো।

আমিও তোমাদের নিয়ে যেতে চাই। তবে কথাটা তোমাদের কাছে স্বপ্নের মত লাগছে, তাই না? কল্পনার মতো লাগছে, কেমন? যদিও এখনই কাউকে বলা যায় না। সেটা এখন চোখে দেখা যায় না। তবু আমি তোমাদের কাছে বললাম, মনে রেখো। এটা আমার ঘরের কথা। সত্যিই এটা আমি করবোই। তাই তোমাদের কাছে বললাম, কেমন?

আমিও তোমাদের নিয়ে যেতে চাই। তবে কথাটা তোমাদের কাছে স্বপ্নের মত লাগছে, তাই না? কল্পনার মতো লাগছে, কেমন? যদিও এখনই কাউকে বলা যায় না। সেটা এখন চোখে দেখা যায় না।

তোমরা দেখেছো, অনেকসময় দর্শন দিতে দিতে আমি ঝিমিয়ে পড়ি। কখনও কখনও পড়ে যাই। পাশের ছেলেরা আমাকে ধরে রাখে। এ ঝিমুনি ঝিমুনি নয়। আমাকে রোগে ধরেছে। গত এক বছর থেকে আমাকে ডাকছে। কিন্তু আমার কাজ শেষ না করা পর্যন্ত আমি যাব না।

আমি অনেকসময় তোমাদের অনেক কষ্ট দেই। অনেকেই অনেক ব্যথা পাও, তাই না? আমার কত কষ্ট লাগে। আমি অনেক সময় কৌশল করে বসে থাকি তোমাদের দর্শন দেবার সময়। তোমরা বলো, 'বাবা, আমার কথা শুনলেন না।' 'আমার সাথে কথা বললেন না।' 'আমার দুঃখ দূর করলেন না।' এক একজনের কণ্ঠে এক একরকমের সুর বের হয়। তোমরা অনেকেই ব্যথা পেয়ে ফিরে যাচ্ছ। এতে আমার খুব কষ্ট হয়। কিন্তু আমি কি করবো? আমি কি চাই না আমার সকল সন্তান শান্তিতে থাকুক, তাদের কষ্ট দূর হোক। আমি কি চাই না? আমি কি পারি না দুঃখ কষ্ট দূর করে

যদি সকলকেই এক এক দিন একটু একটু করে ভাল করে দিতে থাকি এখানকার শান্তির জন্য; তাহলে এটা বিরাট আকারে ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই তোমাদের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য, ভালোর জন্য চুপ করে থাকি।

এখানকার শান্তি দিতে? কণা কণা তিল তিল বারি থেকেই তো কোন বড় জিনিস তৈরী হয়। যদি সকলকেই এক এক দিন একটু একটু করে ভাল করে দিতে থাকি এখানকার শান্তির জন্য; তাহলে এটা বিরাট আকারে ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই তোমাদের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য, ভালোর জন্য চুপ করে থাকি। কথা বলি না। আমার নিজস্ব কোন স্বার্থ নাই। তোমাদের স্বার্থই আমার স্বার্থ। তোমরা যদি এখানকার রোগ, শোক, দুঃখ-জ্বালা ভালো করে দিতে বলো, আর আমি যদি ভালো করে দিতে থাকি, তাহলে তোমরাও ফাঁসবে, আমাকেও একটু ফাঁসাবে। কিছুই হবে না। তাই তোমরা আমাকে একটু রিলিফ দাও যাতে তোমাদের সেই পরমতৃপ্তির জায়গায়, কোটি কোটি গুণ শান্তির জায়গায় নিয়ে পৌঁছাতে পারি, কেমন?

তোমরা এখন কেউ উপলব্ধি, অনুভূতির কথা চিন্তা করতে যেও না। আর মূলাধারে, স্বাধিষ্ঠানে, মণিপুরে, অনাহতে, বিশুদ্ধে, আজ্ঞাচক্রে ও সহস্রারে কি আছে, জানতে চেও না। শুধু মূলাধার থেকে সহস্রারের কথা চিন্তা কোর, তাহলেই হবে।

এখন তোমরা শিবের কাছে প্রভুমীশমনীশ............. গানটা কর। আর শিবের কাছে বলো, ‘বাবা, আমরা আজ শিবরাত্রিতে কেউ তোমাকে খুশী করতে পারিনি। তুমি আমাদের ক্ষমা করো।’

— বাবা, শিব কেন? তুমিইতো আমাদের সব।

— শিব তোমাদের অতিথি। তাঁকে অভ্যর্থনা করবে না? আর আমি তোমাদের বাবা। তাই বলে জ্যাঠামশাই, ঠাকুরদাদাকে ভক্তি করবে না?

শিব চতুর্দশী ছাড়তে আর আধঘন্টা বাকী আছে। চতুর্দশী ছেড়ে গেলে তোমরা সবাই গঙ্গায় গিয়ে মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে আসবে। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

বালক গোঁসাই আমাদের পার করে দাও

সুখচর ধাম
১১ই জানুয়ারী, ১৯৮৪

তখন আমার ৮ বছর ৪ মাস কয়েকদিন। আমাদের বাড়ীর সামনে মাঠ ছিল। আমি সকালবেলা একবার মাঠে যেতাম। আবার বিকাল ৫টার সময় মাঠে যেতাম। মাঠে প্রচুর দর্শনার্থী অপেক্ষা করতো। আমি গেলে আমাকে একটা জলচৌকি দিত। সেই জলচৌকির ওপর দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতাম।

চারদিক থেকে সবাই বলতো শুরু করেছে, ‘ঠাকুর মশাই’, ‘গোঁসাই ঠাকুর, ‘বালক গোঁসাই’, আমাদের পার করে দাও। আমাদের তরিয়ে দাও। আমরা কিভাবে পার হবো, কিভাবে চলবো, বলে দাও। আমি দাঁড়িয়ে বলতে আরম্ভ করলাম। তোমরা যারা যারা এখানে উপস্থিত আছ, তোমাদের কয়েকটি কথা জানাচ্ছি। তোমরা তো জান, জন্ম যখন নিয়েছ, মৃত্যু আছে। **জন্ম এবং মৃত্যু, এই সময়টুকুর মধ্যে আমাদের যা কিছু খেলা। যখন পেটের মধ্যে ছিলে, সেই সময়কার কথা ভুলে গেছ। তারপরেও যখন জন্ম নিলে, সেটাও ভুলে গেছ। এইভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে। প্রথম বছরে যখন পা দিয়েছ, তাও ভুলে যাওয়ার পথে। যতটুকু যা মনে আসছে, সবই ভুলে যাওয়ার পথে। ভুলতে ভুলতে চলেছি আমরা। ক্রমে ক্রমে বয়সের দিকে যখন পা দিচ্ছ, যা কিছু স্মরণে আসছে। আবার বিস্মরণের গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে।**

জন্ম এবং মৃত্যু, সৃষ্টির এই রহস্য কেন? কিসের জন্য এই সৃষ্টি, বুঝতে পারছো? এই যে বিরাট সৃষ্টি, কেন এই সৃষ্টি, সেই কথাটা ভেবেছ কি?

— আজ্ঞে না। কেন এসেছি, তাতো জানি না।

— সৃষ্টির বিভিন্ন কার্যাবলী, সৃষ্টির ধারাপাতায় যে ধারা রয়েছে, এই জগতে, এই মাটির পৃথিবীতে, এই শূন্যগর্ভে বা শূন্যে যা আছে, সেসব কেমন

সাজানো গোছানো, তা লক্ষ্য করেছো?

— আজ্ঞে, দেখতে পাচ্ছি। বুঝতে পারছি না।

— দেখ, সূর্যের কত তেজ, আকাশে তারায় তারায় কত আলো ঝিকিমিকি করছে, কত গ্রহ রয়েছে, চন্দ্রের কত স্নিগ্ধ আলো, এরকম ব্যবস্থা কেউ করে না দিলে কি করে হয়, ভাবো তো দেখি। ঘরের জিনিস কেউ না সরালে নড়ে না, চড়ে না, সরেও না। ঘরের জিনিস সাজালে আমরা বলি, কে এত সুন্দর করে ঘরখানি সাজিয়েছে? একজন যে সাজিয়েছে, সেটা তো মনে পড়ে। সবাই দেখে বলে, 'বাঃ ঘরটা কি সাজানো গোছানো'। বাড়ীর কর্তাকে যদি জিজ্ঞাসা করো, 'কে এত সুন্দর করে ঘরটা সাজিয়েছে?' সে হয়তো বলবে, 'আমার স্ত্রী, আমার কন্যা বা আমার মা ঘরখানি সাজিয়েছে'।

তাহলে কেউ একজন সাজিয়েছে, সেটা তো ঠিক। আর এই পৃথিবীকে, এই শূন্যকে কে এত সুন্দর করে সাজালো, জিজ্ঞাসা কি আসে না? এত নিখুঁত ব্যবস্থা, কোথাও কোন ঠোকাঠুকি, মারামারি নেই। যে যার স্থানে থেকে মনপ্রাণ ঢেলে কাজ করে যাচ্ছে। সূর্য হিংসা করে না চাঁদের সাথে, চাঁদ হিংসা করে না সূর্যের সাথে। বায়ু হিংসা করে না জল মাটির সাথে। এই যে মহাশূন্যের বুকে হিংসাবিহীন, দ্বেষবিহীন শৃঙ্খলা রক্ষা করে যে যার কর্ত্তব্য কর্ম করে যাচ্ছে, এটা কে শিখিয়ে দিল? কার শাসনে চলতে লাগলো? কে এমন সুন্দরভাবে গুছিয়ে দিল? পরস্পরের মাঝে বিরোধিতা নেই, পরস্পরের সাথে কলহ নেই। প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের ব্যবহারে গড়ে উঠেছে এক মধুর সম্পর্ক।

চিন্তা করে দেখ, জল ছাড়া বাতাস নয়। বাতাস ছাড়া জল নয়। আলো ছাড়া মাটি নয়। মাটি ছাড়া বাতাস নয়। একজন আরেকজনকে ছাড়া, কেউ কাউকে ছাড়া চলতে পারে না। কারও সাথে কারও সম্পর্কে ফাটল ধরতে পারে না। বল, কেমন করে এটা হল?

— আজ্ঞে, বুঝতে পারছি না।

— আরও আছে। কোটি কোটি গ্রহ, অগণিত গ্রহ, একেকটি পৃথিবী

থেকে অনেক বড়, তারা ছুটছে ছুটছে ছুটছে। কোন বিবাদ নাই, সংঘর্ষ নাই, গুঁতোগুঁতি নাই। প্রত্যেকে চলেছে এক ছন্দে, একতালে, এক সুরে। কোটি কোটি কোটি গ্রহ, সেই সমস্ত গ্রহগুলো ছুটছে মিনিটে ৮০/৯০ মাইল। কিন্তু এতবড় শরীর নিয়ে ছুটছে তারা। দুইয়ের মধ্যে ধাক্কাও তো লাগতে পারে। যেমন train accident হয়। কিন্তু ধাক্কাতো লাগছে না। কে করছে এত সুব্যবস্থা? আশ্চর্য যে করছে, তাকে কিন্তু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাকে ধরা যায় না। সে কোথায়? কোথায়? কোথায়? কোথায়? কেউ তার হদিশ পাচ্ছে না। কিন্তু তার কাজ চলেছে স্প্রিংয়ের মতো। স্প্রিংয়ের মত গ্রহ, নক্ষত্রগুলো ঘুরছে। পুতুল যেমন ওঠানামা করে, স্প্রিং দিয়ে রাখলে নাচানাচি করে, এই জগৎটাকেও এমন স্প্রিং দিয়ে রেখেছে যে, জগৎটা আপনগতিতে চলছে আপন সুরে চলছে।

তোমরা বুঝতে পারছো, আমার কথা?

— আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাদের খুব ভাল লাগছে।

— আরও বোঝা উচিত। একজন কোটিপতি রাজা। তিনি যদি কথায় কথায় কারও কলম নিয়ে চলে যান, তাঁকে কি চোর বলবে? একথা বললে মনে করবে, হয় ঠাট্টা করছে, না হয় ভুল করছে।

এই অনন্ত জগৎ, এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির ব্যাপারে এতটা যাঁর কারিগরী বিদ্যা, এতটা যাঁর মহিমা, এতটা যাঁর গুণ, এতটা যাঁর সজাগ দৃষ্টি, তাঁর দক্ষতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ আছে? এতবড় সৃষ্টির কি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে? এই বিরাট ব্যাপার। সবাই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। দিশেহারার মতো ঘুরছে কিন্তু হদিশ আর পাচ্ছে না। **কারণ দিয়েই কারণকে খুঁজে বার করতে হয়। জগৎ সংসারের মাঝে এতগুলো কারণ দেখতে পাচ্ছ, তার পিছনে কারণ যদি না থাকে, তাহলে কি করে হয়? এতবড় সৃষ্টির কি উদ্দেশ্য আছে? সেই কারণ বুঝেও বুঝতে পারছি না। খুঁজতে গিয়েও খুঁজে পাচ্ছি না। অনেকে পথ হারিয়ে অন্ধকারে ঘোরে। বাড়ী আর খুঁজে পায় না। বাড়ীর কাছ দিয়েই যাচ্ছে। অথচ বাড়ী খুঁজে পাচ্ছে না।**

আমাদের অবস্থাও তাই। পথ রয়েছে, মত রয়েছে, উদ্দেশ্যও রয়েছে।

আমরা কানা হোলার (অন্ধ বিড়ালের) মত ঘোরাঘুরি করছি। উদ্দেশ্যের পথে, গন্তব্যের পথে গিয়ে পৌঁছতে আর পারছি না। তার জন্যই যত অশান্তি। সবাই বলে উঠলো, গোঁসাই বাবা, আমাদের গন্তব্য পথ বলে দাও।

বালক ঠাকুর — যাঁর মাধ্যমে সৃষ্টি হচ্ছে, এই সৃষ্টির যে কতটা মাধুর্য সৃষ্টবস্তু সমূহের মধ্য দিয়ে তিনি দেখিয়ে দিলেন, বুঝিয়ে দিলেন, আমাদের মাধ্যমে করিয়ে নিলেন। এত সুন্দর এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, পাহাড়-পর্বত, নদী সমুদ্র, সবুজ বন, গাছপালা, ফলে ফুলে ভরা। যেদিকে তাকাও চোখ জুড়িয়ে যাবে। কত সুন্দর ব্যবস্থা। কারও বা সমুদ্রের পারে বাড়ী, কারও বাড়ীর সামনে বাগান, বাগানে কত ফুল, ফল, কত রকমের গাছ, গাছে গাছে কত পাখী, কত মধুর স্বরে তারা ডাকছে, আমাদের মাধ্যমেই সৃষ্ট জীবসমূহের মাধ্যমেই, সৃষ্ট পদার্থের মাধ্যমেই তিনি করিয়ে নিলেন। জন্ম-মৃত্যুর মাঝে এই কদিন থাকবো, এই অল্প সময় আমরা থাকবো, তাতেই যখন এত সুন্দর ব্যবস্থা, তাহলে ভাবতে কি পারি না, আরও সুন্দর ব্যবস্থা অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য? গভর্ণরের বাড়ী দেখেছ? কত সুন্দর করে সাজানো। এই যে কাশ্মীর, যাকে বলা হয় ভূস্বর্গ, কি সুন্দর, কি অপরূপ, কত ফলে ভরা, আপেলে ভরা, মাইলের পর মাইল ফুলের বাগান, চোখ ফিরানো যায় না। মনে হয় যেন, এখানেই স্বর্গের আভাস, স্বর্গের বিবরণ ফুটিয়ে তুলেছে। **আমাদের সুখের জন্য, জীবনধারণের জন্য, এই কয়েক বছরের বসবাসের জন্য পৃথিবীর সবকিছুই হল আভাস। আভাসটা যেখানে এত সুন্দর, তাহলে যেটা গন্তব্যস্থান, সেই উদ্দেশ্যে যদি যাত্রা করি, সেখানে যদি পৌঁছতে পারি, তাহলে পরম সুন্দর, পরম ব্যবস্থার ব্যবস্থা আছে, বোঝা যায় নাকি?** এই সাময়িক ব্যবস্থা দিয়েই বুঝতে হবে চিরকালের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে।

তাহলে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত থাকার ব্যবস্থা, খাবার ব্যবস্থা, ভোগের ব্যবস্থা, যোগের ব্যবস্থা সবই আছে। এরই মাঝে নাচ গান, হাসি আনন্দ যেমন আসছে, রোগ শোক দুঃখ ব্যথাও চালিয়ে নিচ্ছে। সৃষ্টির এত নিখুঁত ব্যবস্থায়, এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারিগরীতে স্রষ্টা যেন এটাই বুঝাতে চান যে, তিনি আমাদের নিয়ে এমন একটা শান্তির জগতে পৌঁছিয়ে দিতে চান, যেখানে জন্মের বালাই নেই, মৃত্যুর বালাই নেই। চিরযুগের যোগাযোগের যোগসূত্রে সুরের সূত্র ধরে

তিনি আমাদের গেঁথে রাখতে চান। এখানে ৬০/৭০ বছরের খেলা যেদিন শেষ হবে, অন্য জগতের উদ্দেশ্যে সেদিন আমাদের যাত্রা হবে শুরু। সেখানে যোগের কোন পরিবর্ত্তন হবে না। সেখানে চিরকাল যাতে আনন্দে থাকা যায়, আমাদের রাখা যায়, তারজন্যই স্রষ্টার এত ব্যবস্থা। এটাই হবে সঠিক কথা। না হলে সন্তান জন্মগ্রহণ করার আগেই মায়ের স্তনে দুধ কেন আসলো? তারপর দাঁত ওঠার সাথে সাথে শক্ত খাবারের ব্যবস্থা কেন করলো? আমাদের সাময়িক সুখভোগের জন্য প্রকৃতি এত আয়োজন কেন করলো? **কোন গ্রন্থের প্রথমেই যেমন থাকে গ্রন্থের ভূমিকা, তার পূর্বাভাস, আমাদের জীবনেও এই পরিদৃশ্যমান জগতে প্রকৃতির মহাদানের এটাই ভূমিকা, এটাই তার সঙ্কেত। সূর্য ওঠার ঘণ্টাখানেক আগে থেকেই পূর্ব আকাশে লাল আভাস দেখা দেয়। এটা সূর্য ওঠার সঙ্কেত। আমরা বুঝি ভোর হয়ে আসছে।**

পূর্বেই যেটা আভাস দেয়, সেটাই পূর্বাভাস, আমাদের সামনে সৃষ্টির, এই পরিদৃশ্যমান জগৎটাই যেন পূর্বাভাস। এই পূর্বাভাস থেকে বুঝে নিতে হবে, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে, সমস্ত গ্রন্থে কি আছে। সৃষ্টির গ্রন্থে, সৃষ্টির বিষয়বস্তু দিয়েই বুঝতে পারবে, তাহা দিয়েই বুঝে নিতে পারবে, পরে কি আছে, না আছে। এখন দেখতে হবে, জীবনের পথে তোমরা কি কি বুঝতে পারছো?

তোমাদের গান ভাল লাগে, নাচ ভাল লাগে, প্রেম ভাল লাগে, মুহূর্ত্তের একটু যে ভাল লাগা, একটু যে আনন্দ, সেই আনন্দ দিয়েই বুঝতে হবে, ওখানে আনন্দের সাগর আছে। আনন্দের পরিপূর্ণতা না থাকলে মুহূর্ত্তের আনন্দ, ক্ষণিকের আনন্দ হতে পারে না। এই জগতের ক্ষণস্থায়িত্ব পরিপূর্ণতারই আভাস দিচ্ছে। আজ আমরা এটাই চিন্তা করবো।

আমাদের আছে দুটি স্থান, গোরস্থান আর শ্মশান। সেখানেই আমাদের চিরশান্তির নিবাস। জীবনের যাত্রা শেষে সেখানেই আমাদের চাপিয়ে রাখে। এর মাঝে, জীবন-মৃত্যুর মাঝে কত রকম অবস্থায় যে আছি, তার ইয়ত্তা নাই। তার মধ্যে কত যে ত্রুটি-বিচ্যুতি, অন্যায় অপরাধ, হিংসা-দ্বেষ করে চলেছি। প্রকৃতির ধারাবাহিকতার ধারায় ভাল-মন্দ দুটোই জমা হবে। একধার থেকে যদি অশান্তি, মেজাজ, হিংসা, সন্দেহ ইত্যাদি জমাট বাঁধতে থাকে, তাহলেই চিন্তার বিষয়। প্রকৃতির ধারাবাহিকতার ধারায় যা যা আছে, তার

থেকে এগুলি সব বহির্ভূত দান। প্রকৃতি উইল (will) করে দিয়েছে। ভাল-মন্দ দুটোই করার অধিকার আছে তোমার। ভাল-মন্দ দুটোরই দেশ আছে তোমাদের জন্য। খালাসের এক দেশ, আবার ফাঁসের আরেক দেশ। ত্রুটি, অপরাধ ইত্যাদি করে যেতে থাকলে তারজন্য নির্দিষ্ট আছে এক স্থান।

প্রকৃতির এই মহাদানের এমন সুন্দর দৃষ্টান্ত রয়েছে চক্ষুর সম্মুখে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র কিরকম পবিত্রভাবে সেবা করছে। তাদের পথ অনুসরণ করলে গন্তব্য পথ হবে তুলনাহীন। সারাদিন যদি নিজের মনকে ক্লেদ, পঙ্কিলতা, অশান্তিতে ভরে রাখি, হিংসা করি, দ্বেষে থাকি, একজন আরেকজনের দিকে বিদ্বেষ ভরা মন নিয়ে তাকিয়ে থাকি, তাহলে তাতেই পরিপূর্ণ হতে থাকবো। পাহাড়ে হীরা, সোনা নানা মূল্যবান পাথর, কষ্টিপাথর আছে। কষ্টিপাথরের ছোঁয়ায় আসল আর নকলের পার্থক্য ধরা পড়ে। আবার দ্বন্দ্ব, হিংসা, অশান্তির পথও আছে। যে ভাল পাথর কুড়াতে পারবে, সে হবে ধনী, সুরের ধনী। আবার মূল্যবান বস্তু কুড়াতে গিয়ে মারামারি লেগে গেল। পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়া হল। কেউ আর মূল্যবান জিনিস কুড়াতে পারলো না। সময় ফুরিয়ে গেল। অশান্তি, ঝঞ্ঝাট কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল তাতে লাভ কি হল? তাই **তোমরা অযথা সন্দেহ করবে না, দ্বন্দ্ব, হিংসা করবে না, অশান্তি করবে না, মেজাজ করবে না। আমারটা আমারই থাকবে। আমি যদি রাগ না করি, কেউ আমাকে রাগ করাতে পারবে না। অযথা কথা বলবে না। এতবড় কর্পূরের মূর্ত্তি আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আমার ওজনটা কোথায় যাচ্ছে? প্রকৃতির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে প্রকৃতির পথে যেন চলি, প্রকৃতি তাই চাইছে। প্রকৃতির পথে বিবেকের পথে যে চলবে, তার জন্য আছে অপূর্ব ব্যবস্থা, আলোর রাজ্য। সেখানে জন্ম-মৃত্যুর ঝঞ্ঝাট পোহাতে হবে না।** গাছ থেকে হয় বীজ, বীজ থেকে ফুল, ফল। ফল থেকে হয় আবার বীজ। একটা বীজ অজস্র বীজ বহন করে। অজস্র বীজ আবার অগণিত বীজ বহন করে। এইভাবে এই সমাজ জীব-জন্তু, পিঁপড়া, পশু-পাখী, মশা-মাছিতে ভরে গেল। প্রকৃতি তাদের জন্য ব্যবস্থা তো করবেন। করেছেন অপূর্ব ব্যবস্থা। তারজন্যই আছে সেই কথা, স্বর্গ-নরক। যদি ত্রুটি-বিচ্যুতি করি, ঐপথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

আবার 'গুরু কৃপাহি কেবলম্'। তিনি তাঁর পবিত্র স্পর্শে যেভাবে ক্লেদ পঙ্কিলতা ঝাড়ু দিয়ে সরিয়ে পরিষ্কার করে দেন, সেটা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি চাইছেন পবিত্র পথে সবাইকে নিয়ে সেই পবিত্র স্থানে অর্থাৎ সুরের জগতে পৌঁছে দিতে, যেখানে চিরযুগ চিদানন্দে মহানন্দে থাকতে পারা যায়। যে আনন্দের শেষ নাই। সেখানে শুধুই নতুনত্ব, শুধু অভিনবত্বের পরে অভিনবত্ব। জন্মের থেকে যিনি সুর নিয়ে এসেছেন, তিনি পারেন এই অভিনব জগতে চিরন্তন বসবাসের ব্যবস্থা করতে। তিনিই অজস্র অজস্র সন্তানকে দীক্ষা দানের মাধ্যমে নামের মাধ্যমে টেনে নিতে পারেন। তা ছাড়া আর কারও পক্ষে ইহা সম্ভব নয়। তিনিই পারেন অগণিত ভক্তকে টেনে নিতে। প্রকৃতির এই যে অনন্ত সৃষ্টি, মাঝে মাঝে জন্মগত মহানদের পাঠিয়ে দেন, যাতে তাঁরা অনেককে টেনে নিতে পারেন। তার জন্যই প্রকৃতির এই ব্যবস্থা। জন্মগত মহানরা মাঝে মাঝে যে আসেন, তাঁরা অনেককে উদ্ধার করে নিয়ে যান। এখানে এসে চোখ বুঁজে সাধনা করে যারা বড় হন, তারা রিক্সা বা ঠেলাগাড়ীর মত কয়েকজনকে নিয়ে যেতে পারেন। আর জন্মগত মহানরা বিরাট। তাঁরা ইঞ্জিন হয়ে রেল ইঞ্জিনের সমস্ত বগীগুলিতে ভর্ত্তি করে সেই অনন্তগতির সাথে এক গতিতে এক সুরে যুক্ত করে চির আনন্দের গন্তব্য পথে নিয়ে যান। তাই তোমরা গুরুর আদেশমতো চল। এভাবে থাকো। অযথা সামান্য ব্যাপারে মনোনিবেশ করবে না। সামান্য ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বে না। **গুরুর আদেশ, গুরুর আজ্ঞা যে যতবেশী পালন করবে, সেই বাজীমাৎ করবে। সুযোগ সুবিধা মতো সঙ্গত করতে হয়। গুরুর তত্ত্ব শ্রবণ করতে হয়। সেটা বড় কঠিন। কাছে থাকলে সুবিধা হয়। প্রকৃতি তাঁর (জন্মগতের) উপরে এমন শক্তি দিয়েছেন যে তিনি যা খুশী করতে পারেন। কারণ তিনি জন্মের থেকেই প্রকৃতির সুর নিয়ে এসেছেন। কঠিন পরিশ্রম করে তিনি এই শক্তি অর্জন করেছেন।** সাধারণতঃ এখানে ১৮/২০ বছরে সাধনা শুরু করে তারপর মহান হয়। আর যিনি সাধনালব্ধ সমস্ত শক্তি নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁর ক্ষমতা অফুরন্ত। এখানে রোজগার করে যে বড়লোক হয়, আর যে dice, তার সাথে কে পারবে? সে (dice) সবাইকে রাজা প্রজা জমিদার বানায়। তার (dice-এর) সঙ্গে competition করে কেউ পারবে? কেউ পারবে না।

জন্মগত মহান যিনি, তিনি যা দেবেন, এখানে কেউ তা দিতে পারবে না। যিনি সাধনার সমস্ত স্তর অতিক্রম করে, সমস্ত শক্তি আয়ত্ত করে,

সাধনমার্গ শেষ করে জন্ম থেকেই dice হয়ে বসেছেন। আর এখানে এসে সাধনা করে যারা রোজগার (আধ্যাত্মিক শক্তি) করছেন, মহান হবার চেষ্টা করছেন,—এই দুইয়ের তুলনা করলে অনেক বেশী কম।

শুধু মুখে মুখে জন্মগত মহান বললেই হবে না। তাঁর চতুষ্পার্শ্বে অনেক প্রমাণ জুটে যায়। পারিবারিক ঐতিহ্য, প্রকৃতির ঐতিহ্যের ধারা বহন করেই তিনি আসেন। তাঁর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব, পাড়া প্রতিবেশী সবাই ছুটে আসছে। সুতরাং তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁর পথে চলতে হলে, ঐপথ পরিষ্কার করতে হলে ধ্যানধারণা জপতপ যতটুকু করতে পার করবে, বাকীটা হ'ল ঠাকুরকে ভালবাসা। ঠাকুরকে ভালবাসলেই সব হয়ে গেল। ঠাকুর যাকে ভালবাসেন, একটু ভালবাসেন তার সব পাপ চলে গেল। শরণাগত ভীতজনে গুরুদেব দয়া কর দীনজনে। গুরুধামে গুরু দর্শন গঙ্গায় স্নান এক ডুবে সব পাপ শেষ।

সবাই পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে উদারা (নৌকা) কখন আসে। মাঝি রাজী নয় পার করতে। মাঝি গররাজী। রাধা বলেছিল,

এক আনা দেব কড়ি,

পার করে দাও তাড়াতাড়ি।

মাঝি বলে, আমি কানা নই। ষোল আনা দিলে কড়ি। পার করে দেব তাড়াতাড়ি।

— বার আনা দেব। মাঝি পার করে দাও।

মাঝি — বাড়াবাড়ি করো না।

— তের আনা দেব কড়ি। পার করে দাও তাড়াতাড়ি।

মাঝি — দেখ দেখি, কেমন করে পার করি তাড়াতাড়ি।

— নয় আনা দেব কড়ি।

মাঝি — দেখ ঠাইরেন (ঠাকরুন)। আমি মাঝি নয়া (নতুন) না। বহুযুগের পুরানা।

শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীদের মাখন, দই সব খেল। শ্রীকৃষ্ণ মাঝি, রাধাকে খেলাচ্ছে।

ওখানে রাধা গাইছে, কৃষ্ণ ডাকি কাতরে, পার কর দুঃখিনী রাধারে। মাঝ যমুনায় নৌকা নাচানাচি করছে, জল উথাল-পাতাল করছে। তারা ষোল আনা দিল।

কৃষ্ণ বলছে, কিছু লাগবে না। চাই শুধু প্রেম ভালবাসা আর মন দক্ষিণা।

তোমাদের সামনে নিজের কথা বলা উচিত নয়। এমন জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত কোন গ্রন্থে পুঁথিতে পাবে না। **এমন সব ঘটনা হাজারে হাজারে সবাই জানে। সেইসব ঘটনার ভিতর দিয়ে তোমাদের সাথে যে অপূর্ব যোগাযোগের সূত্রে গাঁথা, সেই যোগাযোগ যেন চিরযুগ থাকে। কথা উঠবে একদিন না একদিন। কষ্ট আর হবে না। লক্ষ কোটি বছর চলে যাবে। এমন পবিত্র জায়গা। সেখানে শিব বসে আছেন। দেবতারা বসে আছেন। তোমাদের সঙ্গে কথা বলবেন। সেটা ভাল লাগবে না? সে এক আলাদা পৃথিবী, আলাদা ধরণ। একই অথচ ভিন্ন পৃথিবী। খুব ভাল লাগবে। সবটাই তোমাদের এখন গল্প কল্পনায় রয়ে গেছে। যতদিন উপলব্ধি না করতে পারছো, ততদিনই মনে হবে কল্পনায় রয়ে গেছে।**

এখানে ভালবাসা প্রেম করা বৃথা। আবার না করলেও উপায় নাই। এখানে কেউ কারও জন্য অপেক্ষা করবে না। বহু সঞ্চিত বিষয় থেকে তোমরা এসেছ। কাকে আটকাবে? যাওয়াটা যাতে ঠিক হয়, সেটাই দেখবে। কে আগে গেল, কে পরে গেল, দেখবে না। আমি কি ভাইকে রাখতে পারতাম না? আমি প্রকৃতির সহজ পথে বাধার সৃষ্টি করতে রাজী নই। বুদ্ধি দিয়ে, বিচার দিয়ে যা করতে পার কর। তারমধ্যে দৈবশক্তি যদি ব্যবহার করা হয়, অপরাধ। যে জিনিস ধ্বংস হবে না, তার মধ্যে দৈবশক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে। যা থাকবে না, তারমধ্যে মূল্যবান জিনিস ফেলে লাভ কি? কাউকে ব্যাধিমুক্ত করা হলো, ৩ বৎসর চললো। আবার আরেকটা রোগে ধরলো। আবার ৩ বছর চললো। ৬ বছরে ৬ হাজার লোককে নিয়ে যেতে পারতাম। দৈবের

ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি লোকে পায় না। এই পৃথিবীতে বিরল। তুমি কি দশ বছরের জন্য গড়ের মাঠে দশ লাখ টাকা দিয়ে বাড়ী করবে? যে দৈবশক্তি দিয়ে কত বড়, কত বিরাট কাজ করা যায়, তা দিয়ে যদি সামান্য কাজ করা হয়, সেটা ঠিক নয়। হাতী ভাড়া করে নিয়ে তার পিঠে যদি পোলাপানের চুষনি দিয়ে দেয়, কেমন হবে?

সিদ্ধি, মুক্তি, অনিমা, লঘিমা, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ইত্যাদি যাঁর করায়ত্ত, তিনিই হলেন দৈবজ্ঞ। এখানে সাধনা করে দৈবজ্ঞ হতে পারবে না। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পরম ভক্তকে বলেছিলেন, 'তোর একমাত্র ছেলে টাইফয়েড হয়ে মরে যাবে।' সকলে হায় হায় করে উঠলো। শ্রীকৃষ্ণের এমন ভক্ত। তাকে তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) এই আশীর্বাদ করলেন? সঙ্গে ছিলেন অর্জুন। অর্জুনতো মহাক্রুদ্ধ হলেন শ্রীকৃষ্ণের উপর। তখন শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়ে দিলেন, জীবকুল বারবার জন্মাচ্ছে আর মরছে। এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র হতে ভক্তটিকে মুক্ত করার জন্যই তিনি এই আশীর্বাদ করেছেন। সে যদি ৩০ হাজার বার জন্মগ্রহণ করে এবং প্রতিবারে ২টি করে বাচ্চা মারা যায়, তবে তাকে ৬০ হাজার বাচ্চার (সন্তানের) মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। মনে কর, এক একটি জীবনে পাঁচটি সন্তান হলো, আর ২টি করে সন্তান মারা গেল। কারও যদি এইভাবে ১ কোটি বার জন্ম হয় এবং প্রতিজীবনে একটি করে সন্তান মারা যায়, তাহলে তার ১ কোটি বাচ্চা থাকবে না। প্রতি জীবনেই সন্তানের শোক সহ্য করতে হবে। তার চেয়ে একজন্মে একটি সন্তানের মৃত্যুতেই যদি সবটা কাটিয়ে দেওয়া যায়, ভক্তটিকে একটি সন্তানের মৃত্যুর আঘাত সহ্য করিয়ে যদি মুক্ত করে দেওয়া যায়, সেটা কি ভাল হয় না? তাই তোমরা সমূহ দুঃখ দেখবে না। গুরু কখন কি করেন, তার বিচার করতে যাবে না। কখনও মনে করবে না, 'ঠাকুরকে এত ডাকলাম, ঠাকুরতো কিছু বললেন না'।

এই জীবনে তালি দিতে দিতে দেখা গেল, আস্ত মশারিটাই শেষ। তোমাদের জীবনে যে কোন ঘটনাই আসুক, যাই আসুক, তার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করবে না। তারমাঝে দৈবজ্ঞকে টানলে এর চেয়ে দুঃখের আর কিছু নেই। অনেকে বলে, 'ঠাকুর আমাকে শেষ করে দাও। আমাকে নিয়ে ওকে রাখ।' তাতে লাভটা কি? আবার যখন আরেকটা ঝড়

আসবে, দেখা গেল, ৩টা বাচ্চা নাই।

দেবর্ষি নারদ গিয়েছিল মহামায়াকে challenge (চ্যালেঞ্জ) জানাতে। 'আমি নারায়ণের পরম ভক্ত। দেখি, মহামায়া আমার কি করতে পারে?' নারদ মনে মনে ভেবেছিল। নারায়ণ নারদকে পাঠালেন মহামায়ার কাছে। নারদ মনে মনে ভাবছেন, 'নারায়ণ আছেন। মহামায়া আমার কি করবে?'

নারদ গেলেন মহামায়ার কাছে। মহামায়া প্রথমে কিছুই বললেন না। নারদ বললেন, 'এই যে মহামায়া, নমস্কার'।

মহামায়া সহাস্যে বললেন, দেবর্ষি এসেছেন। বেশ, বেশ। আমাদের পরম সৌভাগ্য। আপনি বিশ্রাম করুন। স্নানাহার করুন। পরিচারিকাদের বললেন, 'দেবর্ষির স্নানের ব্যবস্থা করো'।

একজন পরিচারিকা কড়্ঙ্গ, কৌপীন, তেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেবর্ষি ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে নদীতে ডুব দিলেন। ডুব দেবার আগে তৈল মর্দন করার সময় দেবর্ষি ভাবছেন, মহামায়া তো ভালই। ভদ্রমহিলা তো বেশ ভাল সেবার ব্যবস্থা করছে। ভদ্রমহিলা ভাল সেবার ব্যবস্থা করতে পারে। পাড়ে চারজন দাঁড়িয়ে আছে। 'হরি নারায়ণায় ব্রহ্ম' বলে দেবর্ষি ডুব দিলেন। ডুব দিয়ে উঠে দেখেন সে এক অন্য জায়গা। আরেক জায়গায় গিয়ে উঠেছেন। চাষীরা তাঁকে নিয়ে গেছে। সবাই পরম সমাদর করছে। একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে দেবর্ষির বিবাহ দিয়েছে। ৩/৪টি বাচ্চা হয়েছে। দেবর্ষি ভালই আছেন। পরম শান্তিতে সংসার করছেন। তিনি সকালে উঠে চাষীদের সঙ্গে লাঙ্গল নিয়ে চাষ করতে যান। শান্তিতে সংসার করছেন।

মহামায়া তাঁর কি করতে পারলো? নারায়ণ হাসছেন। এদিকে প্রায় ১২ বছর কাটতে চললো। অল্প কিছুদিন বাকী আছে। নারদের বাড়ীর সামনেই খাল। খালের জল বেড়ে গেছে। খাল পার হতে গিয়ে স্রোতের টানে ২/৩টি বাচ্চা ভেসে গেছে। বৌ কাঁদতে কাঁদতে তাদের ধরতে গিয়ে বৌও ভেসে গেছে। নারদের কাছে ছিল একটি বাচ্চা। বৌকে টানতে গিয়ে সেই বাচ্চাটিও ভেসে গেল। এদিকে জল এত বেড়ে গেছে, নারদ নিজেও ডুবে গেল। আবার ভেসে উঠেই দেখে, সেই নদী, যেখানে সে ডুব দিয়েছিল। পাড়ে মহামায়ার

পরিচারিকারা কড়ঙ্গ কৌপীন ইত্যাদি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

‘হরি নারায়ণায় ব্রহ্ম’, নারদ স্নান করে উঠলেন।

মহামায়া মৃদুহাস্যে বললেন, ‘কি দেবর্ষি, কেমন স্নান হয়েছে? মহামায়ার খেলা বুঝেছ? কেমন প্যাঁচ। এক ডুবে বার বছর সংসার করে এলে?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ, বুঝেছি’, নারদ ম্লান মুখে বলেন, মায়ার বাঁধন ছাড়া কি গো যায়? আমি যাই যাই মনে করি, চলিতে না পারি মহামায়া আমার পিছনে ধায়। মায়ার বাঁধন ছাড়া কি গো যায়। মায়ার বাঁধন ছাড়তে বড় মায়া, বড় কষ্ট।

তোমরাও দেখ, চিন্তা করে দেখ। তোমাদের পিছনেও ঠিক এমনিভাবে মহামায়ার খেলা চলেছে। মহামায়া আমার পিছনেও যে ধায়। মায়ার বাঁধন ছাড়া কি গো যায়। আমরা সবাই এক ডুবে এসেছি (জন্মগ্রহণ করেছি), আরেক ডুবে যাব (মৃত্যু হবে)। এসেছি একা। যাব একা। কতবড় কথা। যাকে যখন ভালবাসবে, এটা মনে করে ভালবাসবে। এখানে যে কেউ যেকোন মুহূর্ত্তে ফাঁকি দিতে পারে। যাকে ভালবাসতে যাবে, যাকে যা কিছু করতে যাবে, আজ আছে কাল নাই। Insurance Co. এই জন্যই হাজার হাজার টাকা insure করে, মৃত্যু আছে জেনেও করে। এইজন্যই ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর হাজার হাজার টাকা আটকে আছে। কেউ নিজেকে মারবে না। Insurance Co. জানে মৃত্যু অনিবার্য। তবুও যে যতদিন না মরে, ততদিনই লাভ। বেঁচে থাকার জন্য কাউকে আলাদা করে চেষ্টা করতে হবে না। ডাল ভাত খেয়ে থাকলেও যার যার জীবনটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করবেই।

সংসারে একটি কথা মনে রাখবে। যাকে ভালবাসবে, কেউ থাকবে না। এই কথাটি মনে রেখে সব কাজ করবে। প্রত্যেকের কথা শুনবে অর্থাৎ কি বলতে চায় শুনে নেবে। সবাইকে ভালবাসবে। সব বিষয় জেনে নেবে। যত আপনই হোক, না জেনে কাউকে বিশ্বাস করতে যাবে না। ভালভাবে না জেনে কাউকে বিশ্বাস করবে না।

কেউ যদি বলে, অমুকের বৌ এরকম করেছে, বিশ্বাস করবে না। তার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে নেবে। ছেলে, বৌ, স্বামী যার কথা বলবে, শুনবে। তারপরে যাচাই করে নেবে। এগুলো মানলেই, এইভাবে চললেই অনেকটা সমাধান হয়ে যাবে। মনটাকে বড় কর, মনটাকে সুন্দর কর। কেউ কারও খুঁত বাড়াতে চাইবে না। তর্কে তর্ক বাড়ে। ভালবাসা থাকলে কোন কিছুতেই তর্ক হবে না। যার যার প্রাপ্য থেকে কেউ যেন বঞ্চিত না হয়, লক্ষ্য রাখবে।

রাগ কক্ষণো দেখাবে না, মেজাজ করবে না। কেউ বেশীদিন থাকবে না, মনে রেখো।

কতটা ভালবাসা, কতটা দাবী থাকলে এমন আপন সম্পর্ক হয়। লক্ষ লক্ষ লোক পড়ে রয়েছে আমার। তোমরা এত আপন হয়ে গেছ আমার যে, সামান্য কারণে যেন তোমাদের সাথে বিচ্ছেদ না হয়, এই চিন্তাটা রেখ। তোমাদের উপরে আমার টান আছে, আপনত্ব বোধ আছে। বাপ বেটার সম্পর্ক করেছি। গুরুগিরির সুযোগ নিয়ে ধর্মের নামে অর্থোপার্জন করতে আমি ঘৃণাবোধ করি। দীক্ষা নিয়ে কারও থেকে একটি পয়সাও গ্রহণ করি না। লক্ষ লক্ষ শিষ্যের কাছ থেকে মাসে একটি করে টাকা নিলেও প্রতি মাসে কয়েক লক্ষ টাকা উপার্জন করতে পারি। এর চেয়ে ঘৃণ্য কাজ আর কিছু হতে পারে না। আমি মাথা খাটাব, আমি পরিশ্রম করবো। তোমরা খাটবে, আমিও খাটবো। এইভাবে জীবিকা নির্বাহ করবো। এটা যে গুরুগিরির সুযোগে নয়, প্রত্যেকে মানতে বাধ্য।

তোমরা প্রত্যেকে সুস্থ মাথায় সুস্থ বুদ্ধিতে কাজ করে যাও। প্রত্যেকে মা বাবাকে দেখবে, মা বাবাকে সম্মান করবে। মা বাবার মনে দুঃখ দিয়ে কোন কাজ করবে না। যার যারটা ঠিক রেখে, মিল বজায় রেখে চলবে। প্রত্যেকে ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে বৃহৎ চিন্তায় নিজেকে উৎসর্গ করে দাও। তাহলেই আপাত দৃষ্টিতে সুখের ঘর গড়তে পারবে। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

১) কৃষ্ণা S.T.D. বুথ, বি-২ বাজার, M.A.M.C. দুর্গাপুর - ১০
ফোন - ০৩৪৩-৫৫৬০১২৯

২) রাম নারায়ণ রাম ভবন, মিত্র কুটির ৪৭ নতূন পল্লী, বর্ধমান

৩) Lakshindhar Das, Dularpar, P.O.- Makhanpur
Dist.- Balasor, Orrisa

৪) ১৪২, আহেরী টোলা ষ্ট্রীট, কোলকাতা - ৫, ফোন - ২৫৩০-৪৮০৭

৫) ১নং তুলসীডাঙ্গা লেন, দক্ষিণেশ্বর, কোলকাতা - ৭৬,
ফোন - ২৫৬৪-২৪৪১
৬) ৩ চণ্ডিগড়, মধ্যমগ্রাম, কোল - ১৩০, ফোন - ২৫৩৭-১৫৯৩

৭) ১১/৫, পর্ণশ্রী পল্লী (পার্ক) বেহালা, কোল - ৩৪
ফোন - ২৪৪৫-৯২২০
৮) কোলকাতা বইমেলা।

৯) অনির্বাণ - মা সারদা কমপ্লেক্স, রাজপুর, সোনারপুর, ফোন-২৪৭৭-৬৫৬৬

১০) বেদপ্রজ্ঞা মহিলা সংগঠন লেকটাউন, কোলকাতা, ফোন - ২৫৩৪-৬১৩৬

১১) বলরাম, ৩৪ এস. কে. দেব রোড, কোল - ৭০০০৪৮

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অভিনব দর্শন প্রকাশনের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

	প্রকাশকাল
১) বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টের নিবেদন	শুভ মহালয়া, ১৪১১
২) মৃত্যুর পর	শুভ মহালয়া, ১৪১১
৩) পরপারের কান্ডারী	শুভ বড়দিন, ১৪১১
৪) সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১১
৫) অঙ্গীকার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১২
৬) ১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১২
৭) বীজ ও মহাসৃষ্টি	শুভ মহালয়া, ১৪১২
৮) শুভ উৎসব	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১২
৯) তত্ত্বসিন্ধু	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১২
১০) দেহী বিদেহী	শুভ নববর্ষ, ১৪১৩
১১) পথপ্রদর্শক	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১৩
১২) অমৃতের স্বাদ	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
১৩) বৈদিক বিপ্লব	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৩
১৪) সুরের সাগরে	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৪

বেদপ্রজ্ঞা কমিউনিকেসন্ এর নিবেদন ঃ-

১) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 1) শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-